দাবী আন্দোলন দায়িত্ব

মেজর (অব:) এম.এ.জলিল

''দাবী আন্দোলন দায়িত্ব''

মেজর (অবঃ) এম, এ জলিল

www.pathagar.com

প্রকাশক ঃ
ইতিহাস পরিষদের পক্ষে
এফ, রহমান
ছোট বলিমেহের
সাভার, ঢাকা

ইতিহাস পরিষদ কর্তৃক
সর্বসত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল ঃ
শ্রাবণ ১৩৯৬
আগষ্ট ১৯৮৯

মূল্যঃ পনর টাকা মাত্র।

মুদ্রক ঃ শহীদ সুলতান প্রেস
মগবাজার, ঢাকা

"DABI ANDOLON DAITTO"
Writen by Major (Rtd.) M. A Jalil.
Published by F. Rahman, on behalf of Etihash Parishad.

www.pathagar.com

প্রকাশকেরকথা

মেজর (অবঃ) এম এ জলিল মুক্তিযুদ্ধের একজন সেক্টর কমাণ্ডারই শুধু নন বরং তিনি প্রকৃতিগতভাবেই একজন বিপ্লবী মানুষ। জাসদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে রাজনীতিতে আবির্ভাব হলেও তিনি পরবর্তীকালে ইসলামের বৈপ্লবিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। রাজনীতির বিশ্লেষণে ও চমৎকারভাবে বক্তব্যের উপস্থাপনার ফলে ইতিমধ্যেই তাঁর লেখা কতিপয় বই দেশের পাঠকমহলে দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে। তাঁর লেখা "অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা", "কৈফিয়ত ও কিছু কথা" এবং "সূর্যোদয়" পাঠকমহলে সমাদৃত হয়েছে। আদর্শ ও রাজনীতি বিষয়ক অধ্যয়নের পাশাপাশি তিনি লিখেও চলেছেন। তাঁর লেখা 'দাবী আন্দোলন দায়িত্ব' পুস্তিকায় তিনি একটি ব্যতিক্রমধর্মী বক্তব্য তুলে ধরেছেন। আমরা আশা করি তাঁর এ লেখাটিও পাঠকমহলে ব্যাপক সমাদৃত হবে। এ বইটি পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি।

পরিচালক
ইতিহাস পরিষদ

www.pathagar.com

উৎসর্গ—

স্বৈরাচার বিরোধী চেতনা

এবং

আত্মাহুতির

প্রতি—

www.pathagar.com

ভূমিকা

দেশ ও জাতির উপর সামরিক কর্তৃত্ব চাপিয়ে দেয়ার ধৃষ্টতার বিরুদ্ধে সক্রিয় বিদ্রোহ ঘোষণার মধ্য দিয়েই রাজনীতিতে আমার হাতে খড়ি। তারপর ১৯৭১ সনের ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমার প্রাণপ্রিয় জন্মভূমির স্বাধীনতাকামী মানুষের আশা-আকাংখার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে।

বাংলাদেশের মানুষ বড়ই স্বাধীনতা প্রিয়-স্বাধীনতা তাদের প্রাণেরই আকুতি। সামরিক কর্তৃত্ব এবং স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের আজন্ম ঘৃণা। আমি এদেশের জনসাধারণেরই একজন। স্বভাবতই দেশ ও জাতির উপর সামরিক কর্তৃত্ব আরোপের যে কোন প্রবণতাকে আমিও মনে-প্রাণেই ঘৃণা করি।

স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ঘৃণা পোষণ করা এবং স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পবিত্র এবাদাতেরই শামিল।

বিগত বছরগুলোতে যতবার স্বৈরশাসনের উদ্ভব ঘটেছে প্রতিটির বিরুদ্ধেই আমি সক্রিয়ভাবে লড়ে এসেছি-বিভিন্ন সময় ঐ সকল স্বৈরাচারের হাতে বিভিন্নভাবেই নাজেহাল হয়েছি, জেল-জুলুমের শিকার হয়েছি। স্বৈর মুজীব সরকারের আমলে কারাবন্দী হলেও স্বৈর জিয়া সরকারের শাসন আমলে আমাকে যাবজ্জীবন সাজা প্রদান করে বন্দীশালায় রাখা হয়।

কোনরূপ জুলুমই আমাকে স্বৈরাচার বিরোধী সংগ্রাম থেকে ক্ষণিকের জন্যও বিরত রাখতে সক্ষম হয়নি। বিগত ৭ বছরের স্বৈরশাসন বিরোধী আন্দোলনে আমি বিভিন্ন কারণে পূর্বের ন্যায় অতটা সক্রিয় না থাকতে পারলেও আমার সাধ্যমত আপোষহীনভাবেই সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করে এসেছি। গণবিরোধী ৭ম এবং ৮ম সংশোধনীসহ সকল স্বৈর পদক্ষেপেরই আমি সাংবাদিক সম্মেলন এবং সমাবেশের মাধ্যমে তীব্র সমালোচনা করেছি। তবু আমি অতৃপ্ত, কারণ সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক একটি সরকার প্রতিষ্ঠা ব্যতীত একজন মুক্তিযোদ্ধার আত্মার তৃপ্তি সাধন সম্ভব নয়। সেহেতু স্বৈরশাসন বিরোধী সংগ্রাম আমার এখনো অব্যাহত রয়েছে এবং অব্যাহত ততদিনই থাকবে, যতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশ স্বৈরশাসন মুক্ত না হয়।

www.pathagar.com

বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন দল ও জোটের স্বৈরশাসন বিরোধী আন্দোলন আমি প্রত্যক্ষ করেছি একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে। আমার সেই ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার আলোকেই ''দাবী আন্দোলন দায়িত্ব'' নামে পুস্তিকার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।

আমার এই নগণ্য প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে কোন বিশেষ দল কিম্বা ব্যক্তিত্বকে অহেতুক খাটো করে দেখানোর কোন চেষ্টাই অমি করিনি। তবে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে আমি কারো দোষত্রুটিকে আড়াল করে রাখারও কোন চেষ্টা করিনি।

গঠনমূলক সমালোচনা আমাদের জাতীয় জীবনকে আরো সুন্দর এবং গতিময় করে তুলবে, এই দৃঢ় বিশ্বাস এবং প্রত্যয় সহকারেই আমার মতামত প্রকাশ করেছি। রাজনীতিতে জড়িত কোন দল, জোট, কিম্বা কোন ব্যক্তিই সমালোচনার উর্ধে নয়, আমিতো নয়ই। জাতির একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার আত্মার প্রধান আকুতিই হচ্ছে, দেশ ও জাতিকে স্বৈরশাসন মুক্ত করা। স্বৈরশাসন বিরোধী আন্দোলনে লিপ্ত দল, জোট ও ব্যক্তি, যাদের আমি নির্দয়ভাবেই সমালোচনা করেছি, তারা তাদের দোষ-ত্রুটি সংশোধন করে দেশ ও জাতিকে সুযোগ্য নেতৃত্ব দান করতে পারবেনা এমন কথা আমি বলিনি।

সংগঠিত রাজনৈতিক দলগুলো সুযোগ্য নেতৃত্বেপরিচালিত হলে দেশ ও জাতি বিরাজমান সমস্যা উতরে কাংখিত ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হতে পারে বলেই আমার ধারণা এবং বিশ্বাস। অন্যথায়, সামরিক কর্তৃত্ব এবং স্বৈরশাসনের কবল থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করার অবকাশ কোথায়?

আজ জাতি অসুস্থ, দেশ শাস্ত। এ দেশ ও জাতির দায়িত্ব নেবে কে? এ প্রশ্নটি আজ সকলেরই মনে হানা মারে।

দেশ ও জাতি আজ দায়িত্বশীল, আদর্শবাদী বলিষ্ঠ নেতৃত্ব কামনা করে। আমার কামনাও তাই।

সর্বশেষে, কারো সাথেই আমার কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই। এই পুস্তিকায় যা কিছু পরিবেশিত হয়েছে, তা দেশ ও জাতিকে সতর্ক করে দেয়ার লক্ষ্যেই হয়েছে। আমার যে কোন ভুল-ত্রুটির জন্য আমি সকলের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

এই পুস্তিকাটি প্রকাশনার যারা দায়-দায়িত্ব নিয়েছেন তাদের সকলের কাছে আমি আন্তরিকভাবেই কৃতজ্ঞ এবং তাদেরকে জানাই অভিনন্দন। পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার প্রতি আমাদের সকলেরই তাওয়াক্কুল বা ঈমান ভিত্তিক ভরসা বৃদ্ধি পাক।

৩০শে এপ্রিল'৮৯ — নিবেদক

শাহবাগ, ঢাকা — **মেজর (অবঃ) এম, এ জলিল**

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

''দাবী, আন্দোলন, দায়িত্ব''

১। ভূমিকাঃ

স্বৈরাচার বিরোধী ব্যাপক গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার দাবীতে বিগত সাত বছর ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং সামাজিক দল ও মহলের মহড়া প্রায় শেষ এখন। বিরোধী কন্ঠ স্তব্ধ না হলেও স্তিমিত প্রায়। রণ ডংকা না বাজলেও রণহুঙ্কার মাঝে মাঝে শোনা যায়। যুদ্ধ কি তাহলে থেমে গেল? বিরোধী মহল কি তাহলে পরাজিত? না গোপন সন্ধির রঙিন সুতোয় আবদ্ধ? জনগণের দাবী বলে পরিচিত সেই তথাকথিত ঐতিহাসিক পাঁচ দফার কি হল?

পাঁচ দফা যদি জনগণের অথবা জাতীয় দাবীই হয়ে থাকত, তাহলে সে দাবী পূরণে সরকারকে বাধ্য করা হল না কেন? জাতীয় দাবী পূরণে ব্যর্থ সরকার ক্ষমতা আঁকড়ে থাকবেই বা কেন? কোন অধিকার বলে? একটি স্বাধীন দেশের সরকার জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার অর্থই কী স্বৈরতন্ত্র নয়? জনগণের রক্তে অর্জিত স্বাধীনতা আজো স্বৈরতন্ত্রের কবলে কেন? এ দোষ কার? এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি?

স্বাধীন বাংলাদেশে স্বৈরতন্ত্র শুরু হল কবে এবং কোথেকে? পাপময় সেই ইতিহাস সৃষ্টিকারীদের ভূমিকা বর্তমানে কি একেবারেই গণতান্ত্রিক হয়ে গেছে? ক্ষমতা হারিয়ে ক্ষমতা বহির্ভূতদের অন্তর্গত হয়ে গেলেই কি স্বৈরাচারীরা গণতান্ত্রিক চরিত্রের অধিকারী হয়ে যায়?

পাঁচ দফার পর্যালোচনার পূর্বে এ সকল প্রশ্নের জবাব জাতিকে অবশ্যই জেনে নিতেহবে।

স্বাধীনতা উত্তরকালে যে রাজনৈতিক দলটি ক্ষমতাসীন হয়েছিল তাদের সাড়ে তিন বছরের শাসন আমলের কোনরূপ স্মৃতিচারণের প্রয়োজন রয়েছে কি? তাদের আমলের কীর্তি-কলাপ আমাদের স্মৃতিপটে ভাস্বরই নয় কেবল, সে বেদনাদায়ক,

www.pathagar.com

সে কলংকজনক স্মৃতি আজো দুঃস্বপ্নের মতই জেগে আছে অনেকেরই মানসপটে। সেই ১৯৭৩ সনের জাতীয় সাধারণ নির্বাচনে অনুষ্ঠিত কেলেংকারীর কাহিনী কার না জানা? বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস ঘোষণা করা সত্ত্বেও ক্ষমতাসীন দলটি ক্ষমতার মোহেই অন্ধ হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী কোন দলের প্রার্থীকেই নির্বাচিত হতে দেয়নি। সেদিন এমনকি কিছু কিছু নির্বাচিত প্রার্থীদেরকেও জবরদস্তিমূলক পরাজিত বলেই ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই সর্বনাশা স্বৈরাচারের প্রথম শিকার ছিলাম আমি নিজে। তাই স্বৈরাচারকে আমার কল্পনা করতে হবে না, স্বাধীনতা উত্তর সাড়ে তিন বছরের মধ্যে স্বৈরাচারকে আমি বার বার প্রত্যক্ষ করেছি- স্বৈরাচারকে আমি প্রত্যক্ষ করেছি বাংলার শহরে-নগরে, গ্রামে-গঞ্জে, হাটে-ঘাটে-মাঠে, ক্ষেত-খামারে, কল-কারখানায়, স্কুল-কলেজ-ভার্সিটিতে এমন কি বাংলার বিভিন্ন কারাগারেও। স্বৈরাচারকে দেখেছি মায়ের রক্তাক্ত শূন্য কোলে, স্বৈরাচারকে দেখেছি তরুণী বিধবা বধুর বুকফাটা আর্তনাদে, অসহায় শিশুর অন্নশূন্য মাটির বাসনে। আমি স্বৈরাচার দেখেছি বিপ্লবী, দেশপ্রেমিক জননেতা সিরাজ সিকদারের নির্মম হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। আমি স্বৈরাচার দেখেছি বহুদলীয় গণতন্ত্রের হোতা কর্তৃক আমারই দলের হাজার হাজার মুক্তিকামী তরুণদের অকাল পরিণতির মধ্য দিয়ে। সর্বশেষে, আমি স্বৈরাচার দেখেছি বহুদলীয় গণতন্ত্রের সমাধি রচনার মধ্য দিয়ে এক দলীয় শাসনের উত্থানের কলংকময় অধ্যায় থেকে। স্বৈরাচার চিনতে আমার কখনো ভুল হয়নি। তাই ক্ষমতাহীন অর্থাৎ ক্ষমতা বহির্ভূত স্বৈরাচারদের চেহারাও তাই আমার পরিচিত। তাদেরকেই পুনরায় যখন দেখি 'গণতন্ত্র' পুনরুদ্ধার করার কর্মসূচী নিয়ে মাঠ গরম করতে তখন আমার করুণা হয় আমাদের স্মৃতিশক্তির উপর। এরা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করবে না তো করবে আর কারা? পাঁচ দফার যোগ্য প্রণেতাইবটে?

পাঁচ দফা দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলনে অগ্রগামী ভূমিকা পালনকারী আর একটি দলের ইতিহাস সংক্ষেপে হলেও জেনে রাখা প্রয়োজন। এটি প্রথমত রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ না করে সামরিক জান্তা হিসেবেই ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছিল। ঐতিহাসিক ৭ই নভেম্বর, ১৯৭৫ সনে অনুষ্ঠিত সিপাহী-জনতার মহান অভ্যুথানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিটি পরবর্তীকালে বহু কু-কর্ম বৈধকরণের মধ্য দিয়ে ঐ রাজনৈতিক দলটির জন্ম দেয়। প্রথম সাড়ে তিন বছরের স্বৈরাচারী গোষ্ঠীর কলংকজনক অধ্যায় ৭ই নভেম্বরের অভ্যুথানের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণভাবে মুছে যাওয়ার কথা থাকলেও এই অভ্যুথানের মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি চরম স্বৈরাচারী আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে একের পর এক নতুন কলংকের জন্ম দিতে থাকেন।

www.pathagar.com

সর্বপ্রথমেই তিনি অভ্যুত্থানের প্রধান নায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্ণেল আবু তাহেরকে প্রহসনমূলক বিচারের মধ্য দিয়ে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করেন। তার পরের ইতিহাস আরো জঘন্য, আরো করুণ। তিনি নিজ ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার স্বার্থে কয়েকশত নন-কমিশণ্ড অফিসারদেরকে রাতের অন্ধকারে বিনা বিচারে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করেন। সেনাবাহিনীর ঐ সকল দেশপ্রেমিক সদস্যবৃন্দের অধিকাংশই ছিল '৭১ রের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর যোদ্ধা। সেনাবাহিনীর ঐ সকল বীর যোদ্ধাদের ফাঁসির মাধ্যমে হত্যা করে যে ত্রাসের রাজত্ব তিনি কায়েম করেছিলেন, তার সখেই গড়া রাজনৈতিক দলটি আজ তাঁর অবর্তমানে যখন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য 'জান' দিয়ে ফেলার শপথ করে বেড়ায় তখন সেই শহীদ কর্ণেল তাহেরের বিধবা স্ত্রী এবং অসহায় ও এতিম সন্তানদের মনে 'গণতন্ত্র' সম্পর্কে কোন আশাবাদ জাগে কিনা আমি জানি না। তবে তাদের 'গণতন্ত্র' পুনরুদ্ধারের চীৎকার আমাকে পুনরায় নতুন করে শংকিত করে তোলে। বেচারা গণতন্ত্র তাদের হাতে পুনরুদ্ধার কোনরূপে যদি পেয়েই বসে, তাহলে গণতন্ত্রের যে কী অবস্থাটাই হবে তা ভাবতেও শিউরে ওঠে মন।

স্বাধীনতা উত্তরকালের প্রথম সাড়ে তিন বছর এবং পরবর্তীকালের সাড়ে পাঁচ বছর যোগ ফলের দিক দিয়ে সাড়ে বারো না হলেও মূলতঃ উভয় ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী দেশ ও জাতির 'সাড়ে বারোটাই বাজিয়ে দিয়ে গেছে। স্বাধীনতার প্রায় ১৮ বছর পরে পুনরায় এদেরই কবলে পড়েছে দেশ ও জাতি। তবে এবারে আর ক্ষমতাসীন হিসেবে নয়, এরা উভয়েই আপাততঃ ক্ষমতা বহির্ভূত, কিন্তু বেজায় ক্ষমতাধর বিরোধী দল হিসেবেই দেশ-জাতি এমনকি বিদেশীদের কাছেও একইভাবেই পরিচিত।

এরা যেন মানিক জোড়, তবে এক জোটে নয়, দুটি ভিন্ন ভিন্ন জোটে তাদের অবস্থান। দীর্ঘ সাত বছর ধরেই এরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সরকার বিরোধী জোট হিসেবে জনগণের পক্ষে তুমুল লড়াই পরিচালনা করে করে খ্যাতির দিক থেকে মোটামুটি শীর্ষেই অবস্থান করছেন। পাঁচ দফার সিঁড়িকে অলুক্ষণে না বলে মোটামুটি লক্ষ্মীই বলা চলে। কারণ, দুই জোট প্রধানদের খ্যাতি অর্জনের পেছনে পাঁচ দফা ভিত্তিক আন্দোলনই হচ্ছে প্রধান কারণ। খ্যাতি অর্জন করা অত্যন্ত আনন্দ ও গর্বের কথা, কিন্তু জনগণের জাতীয় দাবী বলে বহুল প্রচারিত পাঁচ দফা পূরণ না হতেই কার নির্দেশে, কিম্বা কার সিদ্ধান্তে আন্দোলনের ময়দান থেকে আকস্মিকভাবেই প্রত্যাখ্যান করে নেয়া হল সেই

www.pathagar.com

তথাকথিত ঐতিহাসিক পাঁচ দফা? জনগণ এ নিয়ে কোন প্রশ্ন না করলেও জনগণের জানার কি কোনই অধিকার নেই?

যার যখন ইচ্ছে হল জনগণের নামে দাবী সাজিয়ে জাতীয় দাবী হিসেবে তা ঘোষণা করা হবে, দাবী দফার সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে খ্যাতি অর্জন করা হবে, মন্ত্রিত্ব অর্জন করা হবে, অর্জন করা হবে লাইসেন্স-পারমিট সহ নানান রকম আর্থিক সুবিধে আর নিজেদের খেয়াল-খুশী মত দাবীনামার দফাগুলো অন্ধ গলির বাঁকে ছুঁড়ে ফেলে নিষ্কৃতি লাভের নামই কি জনগণের আন্দোলন? জাতীয় দাবীর এটাই কি হতে থাকবে পরিণতি? খ্যাতি পিপাসু নেতৃবৃন্দ, সত্যি দেশ ও জাতির রক্তের বদলে ধন্য হয়েছে তোমাদের সখ! পাঁচ দফা তোমাদের জন্য 'পোয়া-বারো'ই হয়েছে!

পাঁচ দফার ইনডেন্ট প্রস্তুতকারী দলগুলোর কারো কারো মুখে এখন ৭ দফা। কারো মুখে ১ দফা অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট এরশাদের পদত্যাগ দাবী শোনা যাচ্ছে। জেনারেল সাহেবও মনে হচ্ছে আন্দোলনকারী শক্তিসমূহের কাছ থেকে আন্দোলনের মারপ্যাঁচ শেখার মধ্য দিয়ে এখন তিনি নিজেই ঐ এক দফার দাবীতেই স্থির এবং অটল অর্থাৎ তিনিও কোনক্রমেই রাষ্ট্রক্ষমতা ছাড়বেনই না।

তাই আপাততঃ তথাকথিত আন্দোলনকারী শক্তির ৭ দফা এবং ১ দফা দাবী ভিত্তিক আন্দোলনের তুলনায় রাষ্ট্রপতি জেনারেল এরশাদ সাহেবের ১ দফার আত্মপ্রত্যয়টি অধিকতর শক্তিশালী বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে।

খেলাটি নিঃসন্দেহে চমৎকার--'সাপ ও মরছে না, লাঠিও ভাঙছেনা'। প্রতিবেশী ভারতের সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দেরাদূনে ভারতীয় সামরিক বিশেষজ্ঞ কর্তৃক বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জেনারেল এরশাদের অক্লান্ত শ্রম, কৌশল এবং সক্রিয় সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত তথাকথিত বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের এই অপূর্ব রাজনৈতিক খেলায় দেশের আপামর জনগণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সমস্যার বহুমুখী অভিশাপে বিমূঢ় প্রায়।

নেতৃবৃন্দের মাঠের প্রতিশ্রুতি, মসজিদে ওয়াদা গোপন ইংগীতের পরশে রূপান্তরিত হয়ে যায় মন্ত্রিত্বে—অঢেল ধন-সম্পত্তিতে। ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটে যায় রাতারাতি। শুধু কেবল প্রতারণার কৌশলটা জানা থাকলেই হল, অন্য কোন গুণাবলীর তেমন কোন প্রয়োজন নেই।

ইতিমধ্যেই বেশ কিছু জাঁদরেল গোছের 'গলাবাজ' জনগণকে রাস্তায় নামিয়ে নিজেরা গিয়ে নিরাপদে ঠাঁই নিয়েছেন রাষ্ট্রপতি এরশাদের মন্ত্রী

www.pathagar.com

পরিষদে। জেনারেল এরশাদের মত সুযোগ্য নেতার পরশে নাকি তাদের 'ফোরটিনথ্ জেনারেশন'ই ধন্য হয়েছে বলে উক্তি করতেও ছাড়েননি।

তাদের মতে, এর পূর্বে রাষ্ট্রপতি এরশাদের মত নেতৃত্ব নাকি বাংলার বুকে আর কোন দিনই জন্মায়নি এবং আর নাকি এমনটা জন্মাবেও না কোনদিন। এটা কেবল রাজনীতির মধ্যেই নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখেননি, গলাবাজিতেও সিদ্ধহস্ত প্রদানের চেষ্টা চালিয়েছেন!

এদেরকে কেবল তোষামোদকারী, কিম্বা মোসাহেব বলে ইতি টানলেই চলবেনা। কারণ এ সকল প্রতিভাধর কীর্তী সন্তান কেউই একেবারে ফেলনা নয়। এদের পশ্চাতে রয়েছে দীর্ঘদিনের সংগ্রামমুখর ভূমিকা। ভূঁইফোঁড় কেউ নন এরা। এরা সকলেই দেশ, জাতি উদ্ধারকারীদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তিবর্গ। এরাই জাঁদরেল শ্রমিক নেতা, এরাই ডাকসাইটে ছাত্র নেতা এবং জননেতা ছিলেন এরাই। এরশাদ সরকারের তোষামোদকারী হয়েছেন বলে, এদের দক্ষতা, বিজ্ঞতার ঘাটতি হয়নি মোটেও।

প্রধানমন্ত্রী, উপ-প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলের নেতা, ফুল মন্ত্রী, হাফ মন্ত্রীসহ অনেক পদইতো দখল করে ফেলেছেন এরা। বুদ্ধি ছাড়া কি আর এসব গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানগুলো দখল করা সম্ভব হত। বোকা জনগণ এবং আন্দোলন পাগল রাজনৈতিক কর্মীরা তাদেরকে কেবল একটু-আধটু 'বেহায়া' বলবে, দালাল-প্রতারক ইত্যাদি বলবে তা না হয় বলুক, প্রাণেতো আর মারবেনা, তাদের মন্ত্রিত্বের আরাম-আয়েশ এবং সুযোগ-সুবিধেগুলোতো আর কেড়ে নিতে পারবেনা! সমালোচনার ভয়ে সুযোগ-সুবিধে ছাড়ার পাত্রই নন তারা। এদের দীর্ঘদিনের সংগ্রামকে এরা মোটেও বিফলে যেতে যে দেননি এটা কি কম সার্থকের কথা! পোড় খাওয়া এদেশের কোটি কোটি জনতার ভাগ্যই খারাপ, তা নাহলে ভাগ্যাহত জনগণ এ সকল সংগ্রামী নেতৃবর্গের কঠোর প্রচেষ্টায় উদ্ধার পেয়েই যেত! ভাগ্যাহত জনগণের পক্ষে মিটিং, মিছিল, দিবস পালন, হরতাল পালনসহ কর্মসূচীতো আর কম পালন করা হয়নি? জনগণের মুক্তি অত সহজে না আসলে প্রতিভাধর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দতো আর এক জায়গাতেই ঠাঁয় বসে থাকতে পারে না। তা 'প্রগতি' বলেতো একটা ব্যাপার-স্যাপার রয়েছে রাজনৈতিক অভিধানে। জনগণ না হয় অজ্ঞ, জ্ঞান-গরীমায় ওরা প্রগতিবাদীরাতো চিরদিনই পরিপুষ্টই ছিল!

সুতরাং আন্দোলনের ভাগ্যে যা হবার ছিল তার ব্যতিক্রম হয়নি মোটেও। একদল সেজেছে মোসাহেব আর একদল 'নাম কা ওয়াস্তে' মোসাহেবদের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধাচারণ করতে গিয়ে গোপনে বার বার নির্বাচনের টোপ গিলেছে। নির্বাচনী খয়-খরচা বাবদ সরকারী 'তোহ্ফা' 'বিধিলিপি'' মনে করেই নীরবে পকেটস্থ করেছে আর মাঝে মাঝে কতকটা ঢেকুর মারার মতই দাবী করে চলছে এরশাদ সরকারের পদত্যাগ। ভাবখানা কতকটা এমন যেন এরশাদের পদত্যাগ না হওয়া পর্যন্ত উনাদের আর খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত হবেনা। প্রতারণারও একটা সীমা থাকার প্রয়োজন। নীল নক্শাটি প্রকাশ্যে জনগণের কাছে ঘোষিত না হলেও অল্প বুদ্ধির জনগণ টোপ গেলা ঐ সকল রাজনৈতিক নেতৃবর্গের ঢেকুরের বদগন্ধ থেকেই মোটামুটি নেতৃত্বের আসল চেহারাটা আঁচ করে নিয়েছে বলেই এখন আর কারো ডাকেই সাড়া দিচ্ছে না। ঐ সকল অধিক বুদ্ধিসম্পন্ন নেতৃবর্গের থলে থেকে বিড়াল বেরিয়ে পড়েছে, এখন আর কোন কৌশলই পূর্বের মত কাজে আসছেনা। সময় বয়ে চলছে, সমস্যা ঘনীভূত হচ্ছে, রাষ্ট্রপতি এরশাদ টলছেনা। তাই জাতি আজ অসুস্থ হলেও দেশ আজ শান্ত! এই অসুস্থ জাতি এবং ক্লান্ত দেশের দায়িত্ব নেবে কে?

২। গাঁয়ে মানে না আপনে মোড়ল

দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রার্থীর সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। কম হবেইবা কেন? পিতার মৃত্যুতে নেতৃত্ব গ্রহণ, স্বামীর মৃত্যুতে দলের নেতৃত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে যারা রাজনৈতিক অঙ্গনে বিরাজ করছে, দেশ ও জাতির দায়িত্ব গ্রহণের ভারটাও অটোমেটিকই যেন তাদেরই কাঁধে বর্তে গেছে ধরনের একটা হাভভাব ঐ সকল নেতৃত্বের মধ্যে বিরাজমান। দেশ ও জাতি তাদের মৃত পিতা এবং মৃত স্বামীর 'কওলাকৃত জমিদারী' ছিল সুতরাং তারা জমিদারীর দখল নেবে নাতো দখল নেবে চাষা-ভূষার সন্তানেরা!

উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত নেতৃত্বের মধ্য দিয়ে যারা নিজেদেরকে দেশ ও জাতির নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত বলে কল্পনা করে থাকেন, তারা জাতির দায়িত্বভার গ্রহণ করাকে যতটা সহজ মনে করে থাকেন, সংগ্রামে লালিত মেহনতী মানুষের প্রতিনিধিরা হয়তো বা তা করেন না- করতে পারেনও না, কারণ দায়িত্ব গ্রহণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তারা অনুধাবন করতে সক্ষম। এই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নেতৃত্ব সব কিছুই সহজে, বিনা শ্রম এবং বিনা ত্যাগে অর্জন করার মানসিকতায় ভোগে। তাই রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত এবং বিভিন্নমুখী সমস্যায় বিজড়িত বাংলাদেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করার মত একটা দুরূহ ব্যাপারেও তারা মোটেও শংকিত নন, বরং অত্যন্ত শিশুসুলভ আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে দেশ ও জাতিকে একথাই বুঝিয়ে দিতে চাচ্ছেন যে, তারা দেশের দায়িত্ব

www.pathagar.com

গ্রহণ করার ব্যাপারটিকে কোন কঠিন কাজ বলেই গণ্য করেন না। তারা দায়িত্বভার গ্রহণ করার জন্য মোটামুটি সদাই প্রস্তুত এবং এ কাজটি করার জন্য তারা সেই কবে থেকেই না এক পায়ে ভর করে আছেন।

দেশ পরিচালনার জন্য উনাদের যোগ্যতার কি আর কোন কমতি আছে! উনারা এ্যাব্বড়া এ্যাব্বড়া রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব কি বহাল তবিয়তে করে যাচ্ছেন না? উনাদের দল উনাদেরকে বিনা প্রশ্নে এবং অনায়াসে নেতৃত্ব প্রদান করে দলকে ধন্য করেনি কী? করেছে। কিন্তু দলের নেতৃত্ব উত্তরাধিকার সূত্রে গ্রহণ করা আর দেশ ও জাতির দায়িত্বভার গ্রহণ করার মধ্যে কি কোনই পার্থক্য নেই? উভয় ক্ষেত্রেই কী যোগ্যতার মানদণ্ড একই থাকবে?

উত্তরাধিকারসূত্রে পিতা, কিম্বা স্বামীর দলের নেতৃত্বভার গ্রহণ করার মধ্য দিয়েই কী দেশ ও জাতি পরিচালনা করার যোগ্যতাও অটোমেটিকই এসে যায় ? না, তা হয় না বাস্তবে। যদি না-ই হয়ে থাকে তাহলে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত তথাকথিত নেতৃত্বের উপর দেশ ও জাতি কোন ভরসায় নির্ভরশীল হবে? কেনই বা হতে যাবে? তবুও এই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নেতৃত্বের অধীনেইতো আজ রাজনীতির প্রধান স্রোতধারা প্রবাহিত হচ্ছে। যোগ্য নেতৃত্বের বিকল্প আজ জনগণের সম্মুখে নেই। জনগণ এই সকল উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নেতৃত্বকে বর্তমান সরকারের বিকল্প হিসেবে গণ্য না করলেও তারাইতো ঘটনাচক্রে দেশ ও জাতির সম্মুখে ভাবি নেতৃত্বের দাবীদার হিসেবে নিজেদেরকে উপস্থাপন করে বেড়াচ্ছেন।

এটা দেশ ও জাতির জন্য আশাবাদের তুলনায় ভয়াবহ বিপদ সংকেতেরই শামিল। কারণ এরা যাদের উত্তরাধিকারিনী, তারা নিজেরাই শাসন ক্ষমতা পরিচালনার ক্ষেত্রে সীমাহীন দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অযোগ্যতা এবং ব্যর্থতার পরিচয় দেয়ার অভিযোগেই নিহত হয়েছেন। ব্যর্থ সরকারসমূহের দুর্বল উত্তরাধিকারিনীদের কাছ থেকে দেশ ও জাতির কী-ই বা প্রত্যাশা থাকতে পারে? দুর্বল উত্তরাধিকারীদের মধ্যে দেশ ও জাতির স্বার্থ রক্ষা করার তাকিদের তুলনায় দায়িত্ব প্রাপ্তির মাধ্যমে ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশী, সখ পূরণ এবং ভোগ লালসা মেটানোসহ প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার-ই নোংরা খায়েশ প্রাধান্য লাভ করে থাকে। এহেন গাঁয়ে মানে না আপনে মোড়লীপনা ধরনের নেতৃত্বের কবল থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত রাখার আবশ্যিকতা দেখা দিয়েছে।

জাতির দায়িত্ব গ্রহণ যে ক্ষেত্রে ক্ষমতা দখল, দায়-দায়িত্বহীনভাবে দখলকৃত ক্ষমতা ভোগ এবং ভোগের মধ্য দিয়ে সমাজে অনাচার-অবিচার, স্বজনপ্রীতি-

www.pathagar.com

সুবিধেবাদ এবং নির্মম স্বৈরাচারের জন্ম দেয়, সে ক্ষেত্রে এ ধরনের নেতৃত্বের কাছে জাতীয় দায়িত্বভার অর্পণের সকল পথ বন্ধ করে দিতে সক্ষম না হলে দেশ ও জাতির ভবিষ্যত অন্ধকার এবং অনিশ্চিতই থেকে যাবে।

জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ কোন সখের বিষয়বস্তু নয়, নয় কোন ভোগ-বিলাস, কিম্বা ব্যক্তিগত সাধ পূরণের মাধ্যম। জাতির নেতৃত্ব গ্রহণের অর্থই হচ্ছে সততা, নিষ্ঠা এবং যোগ্যতার সাথে দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে জাতিকে সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতিনিয়ত তৎপরতা।

ব্যবসার ক্ষেত্রে ফড়িয়াবাজি এবং গোঁজামিল চললেও জাতির নেতৃত্ব দানের প্রশ্নে তা কেবল অচলই নয়, সমগ্র জাতির জন্য আত্মঘাতিও বটে। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নেতৃত্ব দেশ ও জাতির রাজনৈতিক প্রগতির পথে এক বিরাট প্রতিবন্ধকতা।

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নেতৃত্বের কথা বাদ দিলে দেশ ও জাতির সামনে আর যে নেতৃত্ব দৃশ্যমান, তারমধ্যে একটি দলের বিরাটত্ব থাকলেও সে দলটির নেতৃত্ব '৭১রের মুক্তিযুদ্ধে বিরুদ্ধাচরণ করার ফলে আপাততঃ নানাভাবেই বিতর্কের সম্মুখীন। তবে দেশ ও জাতির নেতৃত্ব দানের বিষয়টি যেমন উত্তরাধিকার সূত্রে নির্ধারিত হতে পারে না ঠিক একইভাবে তা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিরও একচেটিয়া অধিকার বলে বিবেচিত হতে পারে না। ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের অর্থই যদি স্থায়ী দেশপ্রেমবোধ হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে, তাহলে আরেকটি অনুরূপ মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত না হওয়া পর্যন্ত দেশপ্রেমের সনদপত্র কেউ কি পাবে না? এরূপ হলে ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তীকাল থেকে এ পর্যন্ত স্বাধীন বাংলাদেশে যারা জন্ম নিয়েছে তাদের দেশপ্রেম নির্ণিত হবে কোন মানদণ্ডের ভিত্তিতে?

তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা না করাই যদি জাতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করার যোগ্যতা, অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে, সেক্ষেত্রে জাতি কী সত্যিকারের যোগ্য নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হতে থাকবে না? জাতির দায়িত্ব গ্রহণ করার যোগ্যতার সাথে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করা না করার সাথে কোন যুক্তিযুক্ত সম্পর্ক থাকতে পারে কী? এমন চিন্তা-চেতনা প্রকৃতপক্ষে এক ধরনের স্বৈরতন্ত্রেরই শামিল। এ সকল প্রশ্নের সুস্থ ও ভাবাবেগহীন পর্যালোচনা এবং বিবেচনা দেশ ও জাতির জন্য যোগ্য নেতৃত্ব সন্ধানে হয়তোবা সহায়ক হতে পারে। এ বিষয়টির নিষ্পত্তি যদি আরেকটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে হতে হয় তা দেশ ও জাতির জন্য হবে বড়ই অমঙ্গলজনক। তবে এ প্রশ্নটির মোটামুটি

www.pathagar.com

গ্রহণযোগ্য নিষ্পত্তির পূর্বে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি হিসেবে চিহ্নিত রাজনৈতিক শক্তির পক্ষে জাতীয় দায়িত্ব গ্রহণ, কিম্বা অর্জনের বিষয়টি সহজ সাধ্য হবে না বলেই সচেতন মহলের ধারণা।

অপরদিকে, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি বর্তমানে নিঃসন্দেহে অতি দ্রুত বিকাশমান এবং গুণগত দিক দিয়েও অন্যদের তুলনায় অগ্রসর। এক্ষেত্রে বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য যে, দেশ ও জাতি কোন ব্যক্তি কিম্বা দলের হস্তে দায়িত্ব এমনিতেই অর্পণ করে দেয়না। দায়িত্বভার গ্রহণ করার যোগ্যতাই মূলতঃ ব্যক্তি কিম্বা দলকে দায়িত্বভার গ্রহণে তৎপর এবং আগ্রহী করে তোলে।

এদিক থেকে বিচার করলেও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত শক্তিটি অন্যদের তুলনায় অনেকাংশেই এগিয়ে রয়েছে। তাদের শক্তি বৃদ্ধি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির কাছে পছন্দনীয় না হতে পারে, তাতে তেমন কিছুই যায় আসেনা। কারণ সংগঠিত শক্তি, কারো পছন্দসই হোক, কিম্বা না হোক, তাতে শক্তির বাস্তবতা কোনক্রমেই হ্রাস পায়না।

শত্রু পক্ষকে কমজোর ভাবার মধ্য দিয়ে চিত্তে সাময়িক স্বস্তি বোধ করা যেতে পারে, তবে সে স্বস্তি যুদ্ধ জয়ে সাহায্য করেনা। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির জাতীয় দায়িত্বভার গ্রহণ করার অধিকার অবশ্যই রয়েছে, তবে সে অধিকার যোগ্যতার সাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত করার পথ অবলম্বন করতে হবে, পরশ্রীকাতরতার মধ্য দিয়ে জাতীয় দায়িত্বভার গ্রহণ করার যোগ্যতা কখনো অর্জন করা যায় না।

দেশ ও জাতির নেতৃত্ব গ্রহণের অপর যে শক্তিটি উল্লেখযোগ্য সেটি হচ্ছে, নাস্তিক্যবাদী দোষে দুষ্ট। দায়িত্বভার গ্রহণে তাদের আগ্রহ কারো তুলনায় কম তা বলা চলে না। তবে কারো আগ্রহ থাকলেই দেশ ও জাতির কাছে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায় না। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের চিন্তা-চেতনা, মন-মানসিকতা, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলের পরিপন্থী মতবাদ ভিত্তিক নেতৃত্ব দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে যতই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকনা কেন, মানুষ তেমন নেতৃত্বের কাছে জাতির দায়িত্বভার সোপর্দ করতে মোটেও আগ্রহী থাকেনা।

তবে বাংলাদেশে নাস্তিক্যবাদ ভিত্তিক মহল মোটামুটি অর্থে সুসংগঠিত থাকলেও, ধর্মই যে সমাজ দেহের প্রাণশক্তি, সেথায় দেশ ও জাতির দায়িত্বভার

www.pathagar.com

গ্রহণের পথ তাদের জন্য এক রকম দুঃসাধ্য বলাই চলে। এ শক্তিটির নিষ্ঠাবান কর্মকাণ্ড ত্যাগী চরিত্র যুব সমাজকে প্রচণ্ডভাবেই আকৃষ্ট করে এবং এরা যদি সমাজ দেহের বাস্তবতা অনুসরণ করতে সক্ষম হয়, তাহলে দেশ ও জাতির দায়িত্বভার অর্জন করা মোটেও অসম্ভব হবে না। নাস্তিক্যবাদের নির্বাসনের মধ্য দিয়ে এ শক্তিটি জনগণের একটি অতি আপন সংগঠনে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য সব রকম যোগ্যতা রাখে।

এ হিসেবের বাইরে আর যারা রয়েছে দেশ ও জাতির দায়িত্বভার গ্রহণে তাদের আগ্রহের কোন সীমাই নেই। এরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন খুঁটির জোরে লম্ফ-ঝম্ফও করে বেড়ায়, তবে জনগণের কাছে এদের বিশ্বাসযোগ্যতা নেই বললেই চলে। এক সময়ের সম্ভাবনাময় নেতৃত্ব কালের স্রোতে সুবিধেবাদের খাতে প্রবাহিত হওয়ার ফলেই সে নেতৃত্ব আজ বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হওয়ার প্রতীক্ষায় দিন গুণছে। জাঁদরেল আজ আর জাঁদরেল নেই, বলিষ্ঠ কন্ঠ হয়ে পড়েছে ক্ষীণ কন্ঠ।

আঁতাত আর সুবিধেবাদের স্রোত তাদেরকে ভাসিয়ে নিয়েছে ভিন্ন শিবিরে, যে শিবির দায়িত্বভার গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে কোন কালেই দেশের জনগণের স্বার্থ রক্ষা করে না।

তবে দেশ নেতৃত্ব শূন্য থাকবে না। দেশপ্রেমিক, ঈমানদার মানুষ দেশ ও জাতি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করে দিয়েছে। দেশের রাজনীতিতে নতুন হলেও আরেকটি দলের নেতৃত্ব সম্পর্কে জনমনে প্রচণ্ড উৎসাহ রয়েছে। সেই দলটির সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করার আশা রাখি।

নেতৃত্ব শূন্য জাতির দায়িত্বভার গ্রহণে যাদের সর্বাধিক আগ্রহ, প্রচেষ্টা, হুমকি-ধমকি জাতি তাদেরকে যোগ্য মনে করে না, বরং তাদের দায়িত্বভার লাভের কথা শুনতেই জাতি ভূত দেখার মতই কতকটা আঁতকে ওঠে। তাদের কথা প্রবন্ধের শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে। বিদেশী শক্তির সহযোগিতায় এবং নানান ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে যারা ক্ষমতা দখলের পথ সন্ধানে সদা ব্যস্ত, জাতি তাদের সম্পর্কে মোটামুটি ওয়াকেফহালও বটে। ক্ষমতা দখলের পূর্বেই তাদের পথ রুদ্ধ করার প্রস্তুতি জাতির আপাততঃ না থাকলেও একথা সত্য যে, ঐ সকল অশুভ মহল কর্তৃক ক্ষমতা দখলের পরপরই তাদেরকে উৎখাত করতে জাতির বড় একটা বেগ পেতে হবেনা। যে জাতি ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগষ্ট এবং ৭ই নভেম্বর সৃষ্টি করতে শিখেছে, সে জাতি তার মুক্তির সঠিক পথ খুঁজে নেবেই।

www.pathagar.com

১৯৭৫ সনের ১৫ই আগষ্টের মূল্যায়ন যে কোন কারণেই হোক আজো সঠিক অর্থে করা হয়নি। জাতির অগ্রগতির জন্যই ১৫ই আগষ্টের সঠিক মূল্যায়ন করা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে। ১৯৭২ সনের জানুয়ারী থেকে শুরু করে ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত যে শাসনকাল বিস্তৃত ছিল, সে শাসনকাল সম্পর্কে তৎকালীন শাসক গোষ্ঠী ও দল ব্যতীত, বাংলাদেশের সকল মানুষেরই প্রায় একই মন্তব্য এবং ধারণা। সে শাসন কালটি ছিল চরম দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতিপূর্ণ, দুঃশাসনে ভরপুর একটি দুঃস্বপ্নের কাল। এই দুঃশাসনের বিরুদ্ধে জনগণ সহকারে একটি রাজনৈতিক দল তুমুল গণআন্দোলন গড়ে তুলেছিল, আর সেনাবাহিনী থেকে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী জনগণ ছাড়াই ছুটে এসেছিল সেই দুঃশাসন মুছে ফেলতে। সেদিন যে দলটি জনগণ সহকারে দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সব রকম ঝুঁকি নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল, তাদের বীরত্ব জনগণের কাছে স্বীকৃত , জনগণের আকন্ঠ প্রশংসা কুড়িয়েছে সেদিনের সরকার বিরোধী নেতৃত্ব। কারণ সহজ, সেই দুঃশাসনের সম্মুখীন হওয়া সেদিন যার–তার পক্ষে সম্ভবই ছিল না। আর তাছাড়া দেশের আপামর জনগণ সেদিন সেই যাতনামূলক দুঃশাসন থেকে প্রতিনিয়তই মুক্তি কামনা করতো।

সেদিনকার সরকার বিরোধী সেই দলটির নেতৃত্ব আন্দোলন এবং বিক্ষোভ অব্যাহত রাখতে রাখতে এক পর্যায়ে সরকারী জুলুম, নির্যাতন এবং স্বেচ্ছাচারীর দাপটে কারারুদ্ধ হয়ে পড়ে। দেশব্যাপী শুরু হয় শোষণ–জুলুমের তাণ্ডবলীলা। বাক স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেয়া হয়। সকল রাজনৈতিক দল বাতিল ঘোষণা করে দেয়া হয় এবং দেশ জুড়ে গুণ্ডা বাহিনীর এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়। শাসক গোষ্ঠীর দল ব্যতীত দেশে আর কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বই রইলনা। দেশের সকল শ্রেণীর লোককে নির্দেশ দেয়া হল সরকারী দলে যোগদান করার জন্য। সরকারী দলের বাইরে কেউ অবস্থান করতে পারবেনা বলেও ঘোষণা দেয়া হল। সরকারী এবং বেসরকারী অফিসের অফিসার এবং কর্মচারীসহ সকলেই সরকারী দলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্রেফ বেঁচে থাকার তাকিদেই যোগদান করা শুরু করল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দও দলে দলে সরকারী দলে বাধ্যতামূলকভাবেই একাত্মতা ঘোষণা করতে শুরু করলেন। এমনকি পুলিশ, বি,ডি, আর ও সেনাবাহিনীর অফিসার এবং সদস্যবৃন্দকেও সরকারী দলে যোগদানের নির্দেশ প্রদান করা হল। সকলেই যোগদানও শুরু করে দিল বিনা প্রতিবাদে। সোচ্চার প্রতিবাদ ছিল কেবল সেই দলটির তরফ থেকে যে দলটি শাসক গোষ্ঠীকে শুরু থেকেই কখনো মেনে নিতে পারেনি। অন্যান্য যারা ছিল তাদের কন্ঠ ছিল নিতান্তই

www.pathagar.com

ক্ষীণ। এমনি শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় একদলীয় শাসন পাকাপোক্ত করার খায়েশেই শাসক গোষ্ঠী ঘোষণা করতে যাচ্ছিল জেলায় জেলায় গভর্ণর নিয়োগ করার মাধ্যমে। দেশে টু শব্দটি পর্যন্ত নেই। জেলায় জেলায় গভর্ণর নিযুক্ত হয়ে গেলেই শাসক দলটি বাংলাদেশে যা ইচ্ছে তাই করতে সক্ষম হবে। তাদেরকে প্রতিহত করার তখন আর কোন উপায়ই থাকবে না। দলীয় গভর্ণরদের মাধ্যমে দোর্দণ্ডপ্রতাপেই তখন তারা দেশ ও জাতির উপর দুঃশাসনের যাঁতাকল চাপিয়ে রাখবে। দেশের মানুষ ভয়ে বিমূঢ়। আসন্ন বিপদ থেকে জনগণ মুক্তি পাবে কি ? কি করেই বা পাবে মুক্তি? মুক্তি ছিনিয়ে আনার মত সে শক্তি পাবে কোথায়? সকলেইতো সরকারী দলে যোগদানের মধ্য দিয়ে নীরবে আত্মসমর্পণ করে যাচ্ছে। যে দলটি সরকারের বিরুদ্ধে ভয়ংকরভাবেই সোচ্চার এবং সক্রিয় ছিল, সে দলটির নেতৃবৃন্দকেতো '৭৪-এর মার্চ থেকেই দেশের বিভিন্ন কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়েছে। তাহলে কী হবে দেশ ও জাতির? দেশ ও জাতিকে মুক্ত করার এমন কোন শক্তিই কী নেই?

নির্যাতিত প্রত্যেকটি মানুষের আত্মার অন্তঃস্থল থেকে যখন প্রায় স্বতস্ফূর্তভাবেই "আল্লাহ আমাদেরকে জুলুমবাজের হাত থেকে বাঁচাও" -এর মত একটা চীৎকার বেরিয়ে আসবে আসবে ঠিক তেমন একটি মুহূর্তেই আকস্মিকভাবেই ছুটে এলো বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে কতিপয় তরুণ অফিসার। এরা সকলেই ছিল মুক্তিযোদ্ধা।

শাসক গোষ্ঠীকে ক্ষমতাচ্যুত করা হল। শাসক গোষ্ঠীকে একদলীয় শাসন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করতে দেয়া হল না। শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে আনা হলো নতুন মোড়। মুক্তি প্রত্যাশী জনগণের কাছে মনে হল তারা মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু ১৫ই আগষ্টের সেই শাসক পরিবর্তনের ঘটনাটি জনগণকে শোষণ-জুলম, অন্যায়-অবিচার থেকে মোটেও মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে কি? ১৫ই আগষ্টের ঘটনাটিই কী পর্যায়ক্রমে জনগণকে সামরিক শাসনের অধীনে বন্দী করে ফেলেনি? এরকম হলো কেন? জনগণের মুক্তির প্রত্যাশায় ১৫ই আগষ্টের অবস্থান কতটুকু? ১৫ই আগষ্টের দ্বারা কে বা কারা উপকৃত হয়েছে এবং জাতীয় জীবনে ১৫ই আগষ্টের তাৎপর্যই বা কী? যারা ১৫ই আগষ্টের মধ্য দিয়ে সরাসরিভাবে উপকৃত হয়েছে তারা ১৫ই আগষ্ট সংঘটিতকারীদেরকে নিছক হত্যাকারী হিসেবেই মনে করে, না ত্রাণকারী হিসেবে গণ্য করে? ১৫ই আগষ্টের ঘটনায় যারা সরাসরিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের মূল্যায়ন যে বিদ্বেষমূলক হবে তা সহজেই অনুমেয়। তবে যারা সরাসরি উপকার কিম্বা ক্ষতিরও সম্মুখীন হয়নি, ১৫ই আগষ্ট সম্পর্কে তাদের মূল্যায়ন হয়তোবা সঠিক মূল্যায়ন হবে। তবে দেখার বিষয়ে হচ্ছে যে,

www.pathagar.com

বিষয়ে হচ্ছে যে, '৭২ থেকে '৭৫-এর আগষ্ট পর্যন্ত সময়সীমাকে যদি আমরা সকলেই মিলে একটা ভয়ানক কালো সময়—দুঃশাসনময় অবস্থা হিসেবেই স্বীকার করি, সেক্ষেত্রে সেই দুঃশাসনের প্রধান হোতাকে যারা অপসারণ করেছে তারা নিঃসন্দেহে কী একটি ভাল কাজ করেনি এবং অভিনন্দনের দাবীদার নয় কি? দেশ ও জাতি তাহলে তাদেরকে সাদরে বরণ করে নিচ্ছেনা কেন? এটি যেমন একটি দিক, অপর দিকটি হচ্ছে, দুঃশাসনকারী ব্যক্তিকে কেবল ক্ষমতা থেকে অপসারণ করলেই কী দুঃশাসন থেকে মুক্ত হয়ে যায় জনগণ? মুক্তির প্রত্যাশার তীব্রতা বৃদ্ধি অথবা কোন আকস্মিক একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনাই কি কেবল জনগণের প্রত্যাশিত মুক্তি এনে দিতে সক্ষম? প্রকৃতপক্ষে এর কোনটিই জনগণের মুক্তির পথ নিশ্চিত করেনা। তবু যারা দেশ ও জাতির দুর্ভোগ নিরসনের জন্য সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করে তারা নিঃসন্দেহে অন্যদের তুলনায় সচেতন এবং প্রশংসার দাবীদার। নির্যাতনের দাপটে অক্ষম জনগণকে যারা নির্যাতন মুক্ত করার বাসনায় জীবনের ঝুঁকি সহকারে সংগ্রামে লিপ্ত হয়, তাদের পরিকল্পনায় দোষ-ত্রুটি থাকতে পারে, তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পূর্বেই ভণ্ডুল হয়েও যেতে পারে। এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী কে বা কারা?

জনগণের নির্যাতীত মনে সার্বক্ষণিকভাবেই বিরাজ করে মুক্তির নেশা এবং প্রত্যাশা, ঘটনা সংগঠিতকারীদের মনে থাকে জনগণকে আকস্মিকভাবে মুক্ত করার একটা অস্পষ্ট স্বপ্ন অথবা ক্ষমতা দখলের লোভ এবং জনগণ ও ঘটনা সংগঠনকারীদের মধ্যে অবস্থিত তৃতীয় পক্ষ নিরাপদেই ওঁত পেতে অপেক্ষা করে তাদের সুবিধে মত সংগঠিত ঘটনার মোড় ঘুরিয়ে দেয়ার লক্ষ্য নিয়ে। ১৫ই আগষ্টকে কেন্দ্র করে ঠিক তাই ঘটেনি কি? সুতরাং জনগণ কেবল মুক্তি কামনা করলেই মুক্তি অর্জন করা কিম্বা কোন আকস্মিক ঘটনা সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে জনগণকে মুক্তি প্রদান করা মোটেও সম্ভব নয়। ১৯৭৫ সনের ৭ই নভেম্বরের ঘটনার মধ্য দিয়েও ঐ একই শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছি আমরা। ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগষ্ট এবং ৭ই নভেম্বরকে এ প্রবন্ধে টেনে আনার পেছনে কারণ কেবল একটিই এবং তা হচ্ছে বিগত সাত বছর ধরেই মোটামুটি একটানা আন্দোলন অব্যাহত রাখা সত্ত্বেও দুর্নীতিবাজ সরকারকে অপসারণ করা যায়নি।

রাজনীতিকদের মনে ব্যর্থতার গ্লানী, ছাত্র-শ্রমিক-কর্মচারীদের মনে চাপা বিক্ষোভ, জনমনে হতাশা এবং পরিবর্তনের স্বপ্ন ও আশা। মানসিকভাবে জাতি আজ অসুস্থ, তবু দেশ কেমন যেন একরূপ শান্ত। তাই স্বাভাবিকভাবেই আমার

www.pathagar.com

মনে হচ্ছে, যে দেশের মানুষ ১৫ই আগষ্ট এবং ৭ই নভেম্বর ঘটাতে অভ্যস্ত তারা তাদের অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি করে ফেললে তাতে মাত্র কয়েকটি প্রহরের জন্য মুক্তির স্বাদ চোখে দেখা সম্ভব হলেও জনগণের ঈপ্সিত মুক্তির প্রত্যাশা তাতে পূরণ হবে কি? হবে না বরং জনগণের মুক্তির সংগ্রামের ধারবাহিকতায় ঘটে যাবে ছেদ এবং শুরু হবে ষড়যন্ত্রের আরেক নতুন মোড়। দুশ্চিন্তা কেবল এখানেই। মুক্তির সংগ্রাম আবারও পিছিয়ে যেতে পারে। জনগণের মুক্তি হচ্ছে একটি দীর্ঘস্থায়ী এবং ধারাবাহিক আদর্শিক সংগ্রামের চূড়ান্ত বিকাশ। জনগণের মুক্তি জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই কেবল সম্ভব। জনবিচ্ছিন্ন কোন ঘটনাই, তা হোক না যতই মহৎ উদ্দেশ্য ভিত্তিক, কোনদিনই জনগণের মুক্তি নিশ্চিত করতে সক্ষম নয়- '৭৫-এর ১৫ই আগষ্ট এবং ৭ই নভেম্বরের অভ্যুত্থানই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। মুক্তির জন্য প্রয়োজন সঠিক সমন্বিত পদ্ধতি - সঠিক সময়ে জনগণের উথান।

৩। মুক্তির পথ কোন বিমূর্ত ধারণা নয়

অধিকার বঞ্চিত মানুষ মুক্তি প্রত্যাশী হয়েই থাকে। প্রত্যাশা নির্ভর এদেশের কোটি কোটি পোড় খাওয়া মানুষ নেতৃত্বের পেছনে ছুটতে ছুটতে আজ হতোদ্যম প্রায়, তবে প্রত্যাশার কোঠা এখনও অপূর্ণ। এই অনির্বাণ প্রত্যাশার অনলই তাদেরকে প্রতিনিয়ত তাড়িয়ে বেড়ায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রাজনৈতিক নেতৃত্বের পেছনে।

প্রতিশ্রুতির বন্ধন ছিঁড়ে কিছু কিছু নেতৃবৃন্দের সহসা পদমর্যাদা লাভ বঞ্চিত মানুষকে সাময়িকভাবে হতাশ করলেও তারা সঠিক নেতৃত্ব চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে ক্রমশই অধিকতর সতর্ক হয়ে উঠতে শিখেছে। সেদিক থেকে বিগত ৭ বছরের স্বৈর সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন ইতিহাসের বিচারে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ নয়।

তবে মুক্তির পথ সাধারণ জনগোষ্ঠীর কাছে আজো একটি বিমূর্ত ধারণা হিসেবেই রয়ে গেছে। কিন্তু মুক্তির পথ নিছক একটি বিমূর্ত ধারণাই কেবল নয়। এখন থেকে এ কারণেই আন্দোলনের রূপ-রেখা মুক্তির ছাঁচেই সাজাতে হবে। ক্ষমতাসীন ব্যক্তির নিছক কেবল পরিবর্তনই যে মুক্তি নয় এ সত্যটি অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে আন্দোলনকারী শক্তি সমূহকে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্য দিয়েই প্রতিফলিত করতে হবে। যে আদর্শকে ভিত্তি করে আজকের

www.pathagar.com

সমাজ ব্যবস্থা টিকে আছে সেই আদর্শের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে জনগণকে স্পষ্টভাবেই অবহিত করতে হবে।

প্রচলিত আদর্শকে জোড়াতালি দিয়ে টিকিয়ে রাখা কিম্বা একে টিকিয়ে রাখতে কোনরূপ সহায়তা করাই যে শোষণ-জুলুম ভিত্তিক সমাজ কাঠামো অব্যাহত রাখারই শামিল, এ সত্যটি জনগণের সম্মুখে সহজ ভাষায় তুলে ধরা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে। কারণ মুক্তির পথ হচ্ছে একটি আদর্শিক সংগ্রাম, আদর্শিক সংগ্রাম জনগণকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক সমস্যা সমূহের সমাধানসহ একটি পরিপূর্ণ জীবন সত্তাবোধে সমৃদ্ধ করে তোলে।

কেবল উপরিকাঠামোগত পরিবর্তন জনগণের উপরোক্ত চাহিদা পূরণে সমর্থ নয় বিধায় আজ প্রয়োজন এসেছে প্রকৃত সমস্যা চিহ্নিতকরণ করা এবং তদনুযায়ী আন্দোলনের কর্মসূচী রচনার মধ্য দিয়ে জনগণকে সেই ঈপ্সিত আদর্শিক নেতৃত্ব সৃষ্টি করার পথে এগিয়ে নেয়া। কারণ আদর্শিক সংগ্রাম পরিচালনা করা লোভী, স্বার্থপর কিম্বা তোষামোদকারী নেতৃত্ব দিয়ে কখনই সম্ভব নয়। একটি স্বাধীন দেশের জনগণের যেমন প্রয়োজন দেশপ্রেমিক এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, ঠিক তেমনিভাবে প্রয়োজন জনগণের প্রকৃত সমস্যা চিহ্নিত করা।

স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশের সমস্যাবলী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে বিভিন্নভাবেই চিহ্নিত হয়ে আসছে। দলীয় দর্শন এবং দৃষ্টিকোণের কারণে জাতীয় সমস্যাবলীতেও স্বাভাবিকভাবেই তার প্রতিফলন ঘটেছে। এর ফলে এক এক দলের এক এক মূল্যায়ন। এই বিভিন্ন রূপ মূল্যায়নের ফাঁকে জাতির মূখ্য সমস্যাসমূহ অপ্রধান হয়ে পড়ে, যার ফলে জাতিগতভাবে আমরা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হওয়ার তুলনায় ঘুরেফিরে কতকটা এক জায়গাতেই অবস্থান করে চলেছি এবং কোন কোন ক্ষেত্রেতো নিদারুণভাবেই পেছনে পড়ে যাচ্ছি। আমাদের কারো যেন তাতে কোন আপত্তি কিম্বা সামান্যতম দুঃশ্চিন্তাও নেই। কারণ আমাদের দৃষ্টিভংগীতে দেশের তুলনায় ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং দলীয় স্বার্থই বড় হয়ে পড়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, এ কারণেই মূল জাতীয় সমস্যাগুলোর কোনরূপ তোয়াক্কা না করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংকীর্ণ স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে নানান দফা সাজিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত এবং বিভক্ত করে দেয়ারই প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

www.pathagar.com

আমাদের মত একটি স্বাধীন দেশের জনগণের মূলতঃ সমস্যাসমূহ কি হতে পারে–স্বাধীনতা–সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা, জনগণের সকল ন্যায্য অধিকার, মর্যাদা এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা এবং নিজস্ব সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা বহাল রেখে জাতির আত্মবিকাশের পথকে উন্মুক্ত রাখা। অপর সমস্যা হতে পারে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবল থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার উপযোগী করে তোলা। এ সমস্যাবলীর সমাধান হলেইতো একটি স্বাধীন দেশ ও জাতি হিসেবে আমরা গর্বের সাথেই সম্মুখ পানে এগিয়ে যেতে সক্ষম হব। আর যে কথাটি এখানে এসে যায় তা হচ্ছে, উপরোক্ত সমস্যাবলীর সমাধান কে দেবে অর্থাৎ দেশ ও জাতি কোন্ শাসনের আওতায় অগ্রসর হতে থাকবে, সামরিক শাসনের আওতায়, না জনগণের একটি প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের আওতায়? জনগণের কল্যাণের স্বার্থে আন্দোলন রচনা করার ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিষয়গুলো ভিত্তিকইতো কর্মসুচী গ্রহণ করা যেতে পারে। আলোচিত বিষয়গুলোকে প্রাধান্য না দিয়ে কেবল সরকার পরিবর্তনের আন্দোলনে জনগণ সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য তেমন তাকিদ বোধ না করারই কথা।

তাই যে এরশাদ বন্যা এবং দুর্যোগের সময় জনগণের দ্বারে দ্বারে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছুটে বেড়ান, সেই এরশাদকে হটাও আন্দোলনে জনগণ শরীক হওয়ার কোন যৌক্তিক হেতুই খুঁজে পায়না। এহেন দাবী বিরোধী দলীয় নেতৃত্বকে প্রকৃতপক্ষে খেলো করেই তোলে। এক্ষেত্রে যে দিকটি খতিয়ে দেখা এবং জনগণকে অবহিত করা প্রয়োজন তা হচ্ছে, বার বার বন্যা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ কেন আঘাত হানে এবং ক্ষমতাসীন সরকার এই দুর্যোগ প্রতিহত করার ক্ষেত্রে কোন বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা নিচ্ছে কী না।

বন্যাকালীন অবস্থায় সরকারের রিলিফ প্রদান তৎপরতার সমালোচনা জনগণের দুর্ভোগ মোটেও হ্রাস করেনা। এহেন অলস সমালোচনার মধ্য দিয়ে বিরোধী দলীয় নেতৃত্ব তাদের সীমাহীন অক্ষমতাই কেবল জনগণের কাছে তুলে ধরে। কারণ, জাতীয় দুর্যোগকালে জনগণ তাদের সংকটের তাৎক্ষণিক সমাধান প্রত্যাশা করে, বিরোধী দল কর্তৃক সমালোচনা তাদেরকে সংকট উত্তরণে মোটেও সাহায্য করেনা, যা করে একটি পাউরুটি, কিম্বা এক টিন বিশুদ্ধ পানি। তাই বাস্তবতার নিরীখেই আজ জনগণের কাছে নতুনভাবে কর্মসূচী হাজির করতে হবে।

রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতা–সার্বভৌমত্ব আজ কতটুকুই বা প্রকৃত অর্থে স্বাধীন? আমাদের প্রাণ প্রিয় স্বাধীনতা –সার্বভৌমত্ব নস্যাৎ করার কোন প্রচেষ্টা চলছে কিনা এবং এর পেছনে কে বা কারা সক্রিয় ? এই

www.pathagar.com

ষড়যন্ত্রের সাথে বাংলাদেশে বসবাসরত কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দল বা মহল সংযুক্ত রয়েছে কিনা এবং থাকলে কে বা কারা? বিদেশী কোন শক্তি জড়িত থাকলে কোন্ সেই শক্তি?

এ সকল প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব দেশবাসীকে আন্দোলনের কর্মসূচীর মধ্য দিয়েই অবহিত করতে হবে। এ সকল প্রশ্নের সঠিক উত্তরদানই জনগণকে স্বাধীনতা–সার্বভৌমত্বের প্রকৃত শত্রু চিনতে সাহায্যই কেবল করবেনা বরং জনগণকে করবে স্বাধীনতা রক্ষার মন্ত্রে উৎসাহিত এবং উজ্জীবিত।

এক্ষেত্রে সামান্যতম গোঁজামিল জনগণের ঈমান এবং আমলে ঘুণ ধরাবে, স্বাধীনতা–সার্বভৌমত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে জনগণকে করে তুলবে দ্বিধাগ্রস্ত এবং দুর্বল।

স্বাধীনতা–সার্বভৌমত্ব কারো দয়ার দান নয়। একটি জাতির কঠিন সংগ্রাম এবং আত্মহুতিই স্বাধীনতা অর্জন করতে সাহায্য করে। অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষার ব্যাপারেটিও কতকটা ঠিক তাই–ই। জনগণের সচেতন এবং ধারাবাহিক গণ–সংগ্রামই স্বাধীনতা–সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার মোক্ষম হাতিয়ার। তাই অর্জিত স্বাধীনতা জনতার সচেতন এবং ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মাধ্যমেই রক্ষা করতে হবে। এ মাটিকে স্বাধীন রাখতেই হবে। এটিই সর্বপ্রথম কাজ। এ প্রশ্নে জাতি, ধর্ম, দল, মত নির্বিশেষেই সকলকে একমত পোষণ করতে হবে এবং এ প্রশ্নে ঐক্যমত বহাল রাখাই হচ্ছে স্বাধীনতা–সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার মূখ্য হাতিয়ার। বিগত ১৮ বছরে রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে, সংকীর্ণ স্বার্থ চরিতার্থ করার কারণে, প্রতিহিংসার কারণে, রাজনৈতিক অঙ্গনে নানারূপ জটিল সমস্যা এবং সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে এ কথা সত্য। সংগে সংগে আবার এ কথাও সত্য যে, ঐ সকল জটিল সমস্যা এবং সম্পর্ক ইচ্ছা করলেই ভুলে যাওয়া অথবা মিটমাট করেও ফেলা যায় না। সহজে ভুলে যাওয়া অথবা মিটমাটের চিন্তা করা বাস্তবসম্মত নয়। কারো ঐক্যের ডাকে ইচ্ছা করলেই অতীতের সব কিছু ভুলে নির্দোষ এবং সরল শিশুদের মত জাতি চট্ করে এক জায়গাতে দাঁড়াতে পারে না।

দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্র করেছে বা করে চলছে, যারা দেশ ও জাতির সম্পদ অপচয়, বিনষ্ট এবং বিদেশে পাচার করেছে, যারা জনগণের উপর অহেতুক নির্যাতন, শোষণ, জুলুম চালিয়েছে; যারা স্বাধীন জাতিকে সামরিক শাসনের আওতায় এবং স্বৈরাচারী শাসনের আওতায় এনে বারবার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ছেদ ঘটিয়েছে তাদেরকে কেউ যদি ভুলে যেতে বলে তারা সজ্ঞানেই দেশ ও জাতির সাথে শত্রুতা করে যাচ্ছে, বিশ্বাসঘাতকতা করে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে কৃত সকল অপরাধেরই বিচার অত্যাবশ্যক। কৃত অপরাধের বিচার এড়িয়ে জাতীয় ঐক্যের ডাক কোন দিনই ফলপ্রসূ হবে না। তবে দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে অপরাধ করলেই যে সে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্নে, ঐক্যমত পোষণ করতে পারবে না তা নয়।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীরাই কেবল স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা করবে এবং ৭১-এর বিরোধী শক্তিসমূহ দেশ ও জাতির স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার ক্ষেত্রেও অংশ গ্রহণ করতে পারবে না, এমন ধারণা অদৌ সঠিক নয়। এমন ধারণা পোষণকারীরা আদৌ স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে ইচ্ছুক কিনা সে বিষয়টি সন্দেহের উর্ধে নয়। কারণ দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার বিষয়টি কারো ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশীর বিষয়বস্তু নয়। এটা নয় কারো একচেটিয়া অধিকারের বিষয়। স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ভোগ করার অধিকার যেমন সকলের রয়েছে, ঠিক একইভাবে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা করারও অধিকার দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকের জন্মগত অধিকার এবং জন্মগত দায়িত্বও বটে। একজন মুসলমান নাগরিকের জন্য দেশ রক্ষার যুদ্ধ হচ্ছে ঈমানেরই অঙ্গ স্বরূপ।

স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার প্রশ্নটির পরে স্বাধীন মাটিতে বসবাসকারী প্রত্যেকটি নাগরিকের অধিকার, মর্যাদা, জান-মাল এবং ইজ্জতের নিরাপত্তার বিষয়টি প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। এ বিষয়টি সম্পর্কে উদাসীনতা স্বাধীনতাকেই অর্থহীন করে তোলে।

ক. অধিকার

প্রথমতঃ অধিকার বলতে প্রত্যেকটি নাগরিকের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান এবং কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ করাকে বুঝায়। এগুলো নিশ্চিত হলেই তার 'অধিকার' শব্দের প্রথম স্তর পূরণকে বুঝায় মাত্র। একজন নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম স্তরই হচ্ছে, তার উপরোক্ত চাহিদা পূরণ। এ সকল চাহিদা অপূর্ণ রেখে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির দাবী অর্থহীন। তাই এই মৌলিক চাহিদা পূরণের প্রচেষ্টাকে প্রতিনিয়ত সক্রিয় রাখা এবং এসকল চাহিদার সাথে জড়িত সমাজের উৎপাদিকা শক্তি সমূহকে সচল এবং ক্রমবর্ধমান হারে উৎপাদনমূখী করে তোলার লক্ষ্যে আন্দোলনের কর্মসূচী রচনা করা আবশ্যক।

www.pathagar.com

উৎপাদিকা শক্তি সমূহ, যেমন কল-কারখানার শ্রমিক-মজুর, ক্ষেত-খামারের কৃষক, দিন মজুর, জেলে, তাঁতী, কামার-কুমার, কাঠ মিস্ত্রীসহ অন্যান্য শ্রমদানকারী পেশার মানুষ যেমন ডাক্তার, প্রকৌশলী, আইনজীবী, লেখক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক এবং শিল্পীদের ন্যায্য অধিকার ভিত্তিক কর্মসূচী প্রণীত না হলে কোন্ স্বার্থেই বা তারা সম্পৃক্ত হবে গণআন্দোলনের ফাঁকা ডাকে?

মানুষের অধিকার আদায়ের দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে তার মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ভোগ। এ মতামত প্রকাশ লেখার মধ্য দিয়ে, সমাবেশে বক্তব্য প্রদানের মধ্য দিয়ে অথবা রাজনৈতিক এবং সামাজিক শক্তিসমূহের দ্বারা সংগঠিত মিছিল, হরতাল পালনসহ বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে হতে পারে। স্বাধীন দেশে মতামত প্রকাশে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি করার অর্থই হল ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ করা।

এই অন্যায় হস্তক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হওয়া, প্রতিরোধ সৃষ্টি করা এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে সংগ্রাম রচনা করা ও অন্যান্য হস্তক্ষেপের বিলোপ সাধন প্রত্যেক নাগরিকের ন্যায্য অধিকার। সরকারের কোন ব্যাখ্যাই নাগরিক অধিকার খর্ব অথবা বিলোপ করার জন্য যুক্তিযুক্ত নয়।

মানুষের অধিকার আদায়ের তৃতীয় স্তর হচ্ছে তার ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠন করার স্বাধীনতা। স্বাধীনতা অর্জনের ১৮ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের মানুষ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সেই স্বাধীনতা প্রকৃতপক্ষে ভোগ করার সুযোগ লাভ করেনি। ক্ষমতাসীন সরকার কর্তৃক তা করতেই দেয়া হয়নি। সুপরিকল্পিতভাবেই এই ভোটাধিকার প্রয়োগের স্বাধীনতা নস্যাৎ করে দেয়া হয়েছে বার বার। কেবল প্রচেষ্টাই যেন এটা ছিল যে, বাংলাদেশে গণতন্ত্র অচল, এখানকার জনগণের জন্য প্রয়োজন 'সামরিক একনায়কতন্ত্র!' এঁতো বছরে এ প্রচেষ্টাই যেন আজ সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে।

বারবার নির্বাচনের পরিবেশ এমনভাবে বিষিয়ে তোলা হয়েছে যে, মানুষ এখন আর ভোট কেন্দ্রে যেতেই সক্ষম হয়ে ওঠেনা অথবা সক্ষম হলেও ভোটদানে সক্ষম হয়না। জনগণ কর্তৃক ভোট প্রদান করার পূর্বেই ভোট পর্ব হয় সমাপ্ত হয়ে যায়, না হয় তাদের ভোট সরকারীভাবে দেয়া হয়ে যায় অথবা ব্যালট বক্স ছিনতাই হয়, গোলাগুলী হয় ভোট কেন্দ্রে। অর্থ এবং অস্ত্রের জোরের কাছে আইন হয়ে পড়ে অচল এবং পরাভূত। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসনকেই বাধ্য করা হয় ভোট কারচুপী করার নেতৃত্ব প্রদান করতে।

www.pathagar.com

নির্বাচনের এমন রূপ মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে জনগণ দেখেনি কখনো। মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে জনগণ নির্বিঘ্নেই ভোট কেন্দ্রে যেতে সক্ষম হত, ভোট প্রদানের পথেও তারা কোনরূপ বাধার সম্মুখীন হত না। তখনকার সময় গণনায় কিছু হেরফের করা হত। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পরের ইতিহাস সম্পূর্ণ ভিন্ন হল কেন? এই আচরণের জন্য কোন বিদেশী শক্তিকে দায়ী করা যায় না।

স্বাধীন দেশে জনগণ ভোট প্রয়োগ অধিকার ভোগ করতে সক্ষম হচ্ছে না কেন? এ প্রশ্ন অবশ্য আজ আর কারো কাছে করা যায় না। দোষ-ত্রুটির জন্য দায়ী উপাদান সমূহকে অবশ্যই চিহ্নিত করতে হবে এবং জনমত সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এর মূলোৎপাটন ঘটাতেই হবে। অন্যথায় স্বাধীনতার সার্থকতা কোথায়?

জনগণের ভোটাধিকার হরণ অথবা নির্বাচন প্রক্রিয়াকে অচল করে দেয়ার সাথে ক্ষমতাসীন সরকার যদি সরাসরি লিপ্ত থাকে, তবে তা সরকারের জন্য একটি অমার্জনীয় অপরাধ। এ ধরনের অমার্জনীয় অপরাধকারী সরকারকে দেশ ও জাতির দায়িত্বে বহাল রাখা আর সজ্ঞানে কোন বিদেশী শক্তির হস্তে দেশ ও জাতিকে তুলে দেয়া যেন একই কথা। কারণ কোন বিদেশী সৈন্য আগ্রাসনী হামলা পরিচালনা করলেই যে কেবল স্বাধীনতা বিনষ্ট হয় তা নয়, দেশের সুবিধাবাদী মহল বিদেশী শক্তির অনুচর হিসেবেও গোপন এবং সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে দেশের জনগণকে অধিকারহীন করে তুলতে পারে। কোন জাতিকে দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করে ফেলার জন্য এই পদ্ধতিটি অধিকতর নিরাপদ। কারণ এই পদ্ধতিটির মূল উদ্দেশ্য বুঝে উঠতে জনগণের দীর্ঘ সময় লাগে।

ভোটাধিকার হরণ অথবা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে হেরফের করা যে জনগণের গচ্ছিত আমানত খেয়ানত করার শামিল, জনগণ ভোটাধিকার হরণের এই সমস্যাটিকে এখনো এতটা গুরুত্ব সহকারে দেখতে শিখেনি অথবা সেভাবে দেখতে অভ্যস্তও নয়। ভোট ছিনতাই, ভোট চুরি এবং নির্বাচন কেন্দ্রে যেতে না দেয়ার বিরুদ্ধে জনগণ এখন পর্যন্ত সাময়িক খানিকটা উত্তেজনা বোধ করে, সরকারকে গালিগালাজ করে, অনেক সময় বিক্ষোভ সভা, মিছিল এবং হরতাল পালনের মধ্য দিয়ে পুনরায় নিশ্চুপ হয়ে পড়ে। এ ধরনের অপরাধ যে দেশ ও জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতারই শামিল এ সত্যটি আজো জনগণের উপলব্ধির বাইরেই রয়ে গেছে। চোখের সম্মুখে নিজ অধিকার ছিনতাই হতে দেখেও তা মেনে নিয়ে নিশ্চুপ থাকার অর্থই কী দাসত্বপনা নয়? যে জাতি জেনে-শুনে অধিকার বঞ্চিত থাকতে অপত্তি করে না, বহিঃশত্রুর দস্যিপনা আগ্রাসনী হামলার বিরুদ্ধে সে জাতি কিভাবে রক্ষা করবে তার স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব?

www.pathagar.com

সুতরাং সরকার কর্তৃক ভোট চুরির অর্থ কেবল মাত্র চুরিই থাকছেনা, এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে দেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধেই এক ধরনের কৌশলপূর্ণ ষড়যন্ত্র। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগুতে এগুতে প্রশাসন সম্পূর্ণ অচল হয়ে যাবে, আইন-কানুন হয়ে পড়বে অকার্যকর এবং জনগণের বিবেকও ধীরে ধীরে হয়ে যাবে ভোঁতা। জনগণ সরকার নির্বাচনের ব্যাপারে হয়ে উঠবে নিস্পৃহ। তাহলেইতো ষড়যন্ত্রকারীদের স্বার্থ পূর্ণ হয়ে যায়। তখন তারা খেয়াল-খুশীমত দেশ ও জাতিকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে সক্ষম হবে।

তাই জনগণের অধিকার রক্ষার প্রশ্নে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে আরো সজাগ-সক্রিয় এবং সৎ হয়ে উঠতে হবে। অর্থের অভাবে জনগণের অধিকার অপূরণ থাকতে পারে, তবে সরকারের ইচ্ছার অভাবে জনগণের কোন অধিকারই অপূর্ণ রাখা যাবে না। অপোষহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়েই এমন সব অধিকার আদায়ের দায়িত্ব রাজনৈতিক নেতৃত্বকেই গ্রহণ করতে হবে। একটি স্বাধীন দেশের নাগরিকের জন্য এরপর যে বিষয়টি রয়েছে তা হচ্ছে মর্যাদা রক্ষার প্রশ্ন।

খ.মর্যাদা

নিঃসন্দেহে মর্যাদা রক্ষার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ এবং বেশ জটিলও। দেশ ও জাতির জন্য কি কি কাজ করলে দেশ-জাতির মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং কোন্ ধরনের কর্ম থেকে বিরত থাকলে দেশ-জাতির মর্যাদা রক্ষা পায় তা জানা থাকা দরকার। বাংলাদেশে কে কারই বা মর্যাদা রক্ষা করবে? জনগণ যেখানে অধিকারহীন, সরকার সেখানে মর্যাদাশীল সরকার হিসেবে গণ্য হতে পারে না।

জনগণের মর্যাদা বৃদ্ধির সাথে সাথেই বৃদ্ধি পেতে থাকবে সরকারেরও মর্যাদা। ভোট জালিয়াতির মধ্য দিয়ে সরকার গঠন প্রক্রিয়া সরকারের মর্যাদা বৃদ্ধি করে না এবং কোন মর্যাদাহীন সরকার দেশের জনগণের মর্যাদা বৃদ্ধি, কিম্বা রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে কোন যুক্তিতে?

নিজেকে মর্যাদাশীল করে তোলা এবং অপরকে মর্যাদাশীল হতে সাহায্য করার বিষয়টি হচ্ছে একটি সুমহান আদর্শিক চেতনারই অভিব্যক্তি। যারা নানান রকম ছল-ছুতোয় মানুষের অধিকার খর্ব কিম্বা বিলোপ করে দেয়াকে কোনরূপ অপরাধই মনে করে না, তারা নিঃসন্দেহে সেই সুমহান আদর্শিক ভিত্তি হতে অনেক দূরে। সুতরাং বাংলাদেশের মানুষের মর্যাদা রক্ষা কিম্বা মর্যাদা বৃদ্ধির দায়-দায়িত্ব বর্তমান সরকার গ্রহণ করতে যে কেবল অপরাগই

www.pathagar.com

-তা নয়, তারা বরং সজ্ঞানেই এদেশের মানুষকে তাদের কোন বিদেশী প্রভুর সন্তুষ্টির কারণে মর্যাদাহীন করে রাখতেই বদ্ধপরিকর। আর তাইতো বিদেশ থেকে দেদার চলছে ভিক্ষাবৃত্তি, খাদ্য ভিক্ষা, অর্থ ভিক্ষা, অস্ত্র ভিক্ষাসহ সকল ধরনের ভিক্ষাবৃত্তির প্রতিযোগিতা। পরনির্ভরশীলতা হ্রাস করার ইচ্ছা বাদ দিয়েই পরনির্ভরশীলতা ক্রমশঃই বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এ ধরনের ভিক্ষাবৃত্তি দিয়ে জাতিকে দুমুঠো ভাত গিলাতে সক্ষম হলেও, সরকার দেশ ও জাতির মর্যাদা রক্ষা করার ক্ষেত্রে হয়ে পড়েছে মেরুদণ্ডহীন। জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ কখনো বিদেশী ভিক্ষার মাধ্যমে সম্ভব নয়। সম্ভব হলেও মৌলিক চাহিদা পূরণের অর্থ জনগণের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা নয়। মৌলিক চাহিদা পূরণের অর্থ হচ্ছে, মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক ধাপ বা প্রাথমিক শর্ত পূরণ করা। মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য বৈষয়িক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যিক প্রয়োজন, তবে কেবল বৈষয়িক ভিত্তির উপরই মানুষের মর্যাদা নির্ভরশীল নয়। মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রয়োজন মানুষের সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক বিকাশ। এক কথায় সুস্থ আদর্শিক বিকাশই মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

স্রষ্টার ঘোষণা অনুযায়ী মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। এই সৃষ্টির সেরা জীবটির শ্রেষ্ঠত্ব বিকশিত হওয়ার উপযুক্ত ক্ষেত্র অবশ্যই সৃষ্টি করতে হবে। সৃষ্টির সেরা জীবটির সংগ্রাম কেবল অন্ন-বস্ত্রকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হতে থাকলে তার শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করার সুযোগ আর কোথায়ই বা রইলো?

•

মনন জগতকে অসুস্থ রেখে বৈষয়িক ভিত্তি রচনার যতই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাক না কেন, সে প্রচেষ্টা কখনোই মানুষের মানসিক অসুস্থতা দূর করতে সক্ষম হবে না। সুতরাং অসুস্থ জাতির সুস্থতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন ধারাবাহিক একটি আদর্শিক সংগ্রাম। কোন্ সে আদর্শিক সংগ্রাম?

এ সংগ্রাম মানুষের মধ্যে নৈতিক এবং সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করার সংগ্রাম -মানুষের মনন জগত সৃষ্টি করার সংগ্রাম, যে মনন জগতের সাহায্যে মানুষ ভাল-মন্দের বিচার করবে, মন্দ পরিত্যাগ করে ভালর লালন করতে উদ্যোগী হবে। স্রষ্টার সৃষ্টির রহস্য অনুধাবন এবং রহস্য উদঘাটনে গবেষণায় লিপ্ত থেকে গবেষণালব্ধ জ্ঞান ভাণ্ডার দিয়ে মানুষের কল্যাণ কার্যে নিয়োজিত থাকবে এবং উত্তরোত্তর স্রষ্টার নৈকট্য লাভের দিকেও অগ্রসর হতে থাকবে।

আদর্শিক সংগ্রাম মানুষের মূল্যবোধই কেবল সমৃদ্ধ করেনা, মূল্যবোধের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ভারসাম্যও রক্ষা করতে শিখায়। এই আদর্শিক সংগ্রামের ভিত্তি বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ এবং দর্শন ভিত্তিক হতে পারে, তবে তা কখনো

www.pathagar.com

পবিত্র ইসলাম ধর্মের সমকক্ষ কোন মানদণ্ডই যে হতে পারে না তা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত। কারণ, আর্থিক এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের সমন্বয় ইসলাম যে আঙ্গিকে ঘটায়, তা অন্য কোন দর্শন কিম্বা ধর্মের মধ্য দিয়ে আদৌ সম্ভব নয়— বাংলাদেশের ক্ষেত্রেতো নয়ই। তাই বাংলাদেশে মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলাম ভিত্তিক একটি আদর্শিক সংগ্রাম অব্যাহত রাখা অত্যাবশ্যকীয় বলেই আমি মনে করি। এক্ষেত্রে যতই শৈথিল্য এবং অনীহা প্রকাশ পাবে, আমাদের জাতীয় জীবনে মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যটি ততই পিছিয়ে থাকবে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বী বাংলাদেশী মানুষের জন্য আদর্শিক সংগ্রাম তাদের নিজ নিজ ধর্মকে ভিত্তি করেই হতে হবে। তবে ইসলাম ধর্মের সার্বজনীন মানব কল্যাণ এবং সাম্যমূখী দিকগুলো সম্পর্কে সকলের সচেতন ধারণা লাভ সংখ্যাগরিষ্ঠের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে উভয়ের জন্যই মঙ্গলজনক করে তুলতে পারে।

এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিরাজমান সরকারসহ জনগণকে নেতৃত্বদানে আগ্রহী রাজনৈতিক দল ও মহলকে সুস্থ পরিকল্পনা সহকারেই এগিয়ে যেতে হবে। ধর্মের কথা আলোচনা করাতেই যারা এরমধ্যে সাম্প্রদায়িকতা আবিষ্কার করে বসেন তারাই প্রকৃত অর্থে সমাজ দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত খাতে প্রবাহিত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। গণআন্দোলন রচনার মধ্য দিয়ে এহেন মহলের মুখোশ উন্মোচন করার সময় এসেছে। এ কথা সকলকেই স্মরণ রাখতে হবে যে, ধর্মের লক্ষ্য সাম্প্রদায়িকতা ছড়ানো নয়, ধর্মের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে মানুষের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা।

গ. জান–মাল এবং ইজ্জতের নিরাপত্তা

এরপর আসে জান-মাল এবং ইজ্জতের নিরাপত্তা বিধানের প্রশ্ন। একটি স্বাধীন দেশের নাগরিকের জান-মাল এবং ইজ্জতের নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশ্নটি স্বাধীনতার সংগে ওতপ্রোতভাবেই জড়িত। জান-মাল এবং ইজ্জতের নিরাপত্তাহীনতা স্বাধীনতাকে অসার করে তোলে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোন সরকারই জনগণের জান-মাল এবং ইজ্জতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কেবল অক্ষমই রয়ে যায়নি, বরং এ প্রশ্নে প্রত্যেকটি সরকারই চরম গাফিলতির পরিচয় দিয়েছে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন নিজেই রয়ে গেছে নির্যাতনমূলক –যেমন '৭৪ সনে প্রবর্তিত 'স্পেশাল পাওয়ার এ্যাক্ট' যা যে কোন নাগরিককে বিনা অজুহাতে এবং বিনা নোটিশে হয়রান করা এবং গ্রেফতার করে নিরাপত্তা বন্দী

www.pathagar.com

হিসেবে কারাগারে প্রেরণ করার ক্ষমতা রাখে। এই 'স্পেশাল পাওয়ার এ্যাক্ট' কোন স্বাধীন দেশের জন্য উপযোগীতো নয়ই বরং কলংকজনকও বটে।

রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে প্রাপ্ত স্বাধীনতার দাবীদার একটি জাতির জন্য আইনের এই ধারাটি স্বাধীনতার প্রতিই একটি সক্রিয় চ্যালেঞ্জ স্বরূপ।

এছাড়াও প্রশাসনিক হয়রানি প্রকৃত অপরাধীদের প্রতি আইন প্রয়োগের শিথিলতা জনগণের নাগরিক জীবনকে দুঃসহ করে তুলেছে। খুন, গুম, লুটতরাজ, নারী ধর্ষণ এবং মাস্তানদের দাপট জনগণের জান-মাল এবং ইজ্জতের উপর প্রতিনিয়ত সংকটেরই আলামত স্বরূপ বিরাজ করছে। ঘুষ এবং দুর্নীতির কাছে জান-মাল এবং ইজ্জত তুচ্ছ লুটের বস্তুতে পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্রের প্রধান পরিচালক ঘুষ এবং দুর্নীতির উর্ধে না থাকলে রাষ্ট্রের জনগণ স্বাভাবিকভাবেই ঘুষ এবং দুর্নীতির কাছে অসহায় জিম্মি হয়ে পড়ে। অপরদিকে, সুবিধে ভোগী সামাজিক টাউট শ্রেণীর দৌরাত্ম বৃদ্ধি পেয়ে পেয়ে ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই রাষ্ট্রের নিরীহ সাধারণ জনগণের জান-মাল এবং ইজ্জতের তখন আর কোনই নিরাপত্তা থাকে না।

স্বাধীনতার পর বেশ কয়েকবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় রদবদল হলেও, জনগণের জান-মাল এবং ইজ্জতের নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশ্নটি সংকটাপন্নই রয়ে গেছে এবং দিন দিন সংকট যেন আরো ঘনীভূত হয়েই চলছে। প্রকাশ্যে নারী ধর্ষণ এবং লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করার পরও অপরাধীরা আইনের চোখ এড়িয়ে সমাজে মাথা উঁচু করেই চলার সুযোগ পাচ্ছে।

অপরাধের শেষ নেই, শেষ নেই সংকটেরও। জনগণের এহেন দুর্গতিতে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী মোটেও বিচলিত কিম্বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বলে প্রতীয়মানই হচ্ছে না।

পূর্বেই আমি উল্লেখ করেছি যে, মর্যাদাহীন সরকার কোন দিনই জনগণের মর্যাদা রক্ষা করার তাকিদ বোধ করেনা। রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন তারা এমনভাবে রচনা করে যা কেবল ক্ষমতার সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গেরই জান-মাল এবং ইজ্জত রক্ষা করার স্বার্থেই নিবেদিত থাকে। 'জনগণের হিল্লা জনগণই করে নিক' ভাবখানা কতকটা সে রকমই প্রায়।

এখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জান-মাল এবং ইজ্জতের নিরাপত্তার বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়।

www.pathagar.com

সংখ্যালঘু বলতে বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়, খৃষ্টান সম্প্রদায়, বৌদ্ধ সম্প্রদায়সহ উপজাতীয় সম্প্রদায় সমূহও অন্তর্ভূক্ত। এরা সংখ্যালঘু হিসেবে পরিচিত ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই কেবল। তাছাড়া তারাও বাংলাদেশেরই নাগরিক এবং বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী তাদের অধিকার এবং দায়িত্ব একই, যা সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের জন্য স্বীকৃত। সংবিধান মতে সংখ্যালঘু হিসেবে চিহ্নিত করার কোনই অবকাশ নেই। কেবল ধর্মীয় পরিভাষায় তারা সংখ্যালঘু হিসেবে চিহ্নিত।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো এবং প্রশাসনিক কাঠামো যেহেতু ধর্মীয় অনুশাসন ভিত্তিক নয়, সেহেতু বাংলাদেশের হিন্দু , বৌদ্ধ, খৃষ্টান এবং উপজাতীয় সম্প্রদায় সমূহকে সংখ্যালঘু হিসেবে চিহ্নিত করার কোন যৌক্তিকতাও থাকতে পারেনা। তাদেরকে সংখ্যালঘু হিসেবে মনে করার অর্থই হচ্ছে বাংলাদেশকে বিশেষ কোন ধর্মীয় শাসনের আওতাভুক্ত রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকার করে নেয়া। কিন্তু বাস্তবে তা আদৌ নয়। বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত বিশেষ কোন ধর্মের ভিত্তিতে অনুশাসিত এবং পরিচালিত নয়। বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত অনুন্নত পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের অধীন এবং উপনিবেশিক প্রশাসনিক পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদ নির্ভর একটি নতুন রাষ্ট্র। সাম্রাজ্যবাদ নির্ভর রাষ্ট্রীয় কাঠামোই সকল কর্মকাণ্ড পুঁজিবাদী দর্শনের ভিত্তিতেই আনৃজাম দিয়ে থাকে। সুতরাং পুঁজিবাদী অর্থনীতির দাপট এবং উপনিবেশিক প্রশাসনিক পদ্ধতির নির্মমতার অসহায় শিকার বাংলাদেশের প্রত্যেকটি সাধারণ নাগরিকই। এক্ষেত্রে যে শোষণ-জুলুম, অন্যায়-অবিচার পরিলক্ষিত হয় এবং সাধারণ নাগরিক যে কারণে অধিকার বঞ্চিত থাকে, নিষ্পেষিত বোধ করে, তা মূলতঃ রাষ্ট্রীয় চরিত্রের কারণেই কেবল। এই বঞ্চনা, লাঞ্ছনা, নিষ্পেষণ থেকে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে বাংলাদেশের কোন নাগরিকই মুক্ত নয়। সুতরাং বাংলাদেশে বঞ্চনা, লাঞ্ছনা কিম্বা নিষ্পেষণের কারণ বিশেষ কোন ধর্ম নয়, বরং পুঁজিবাদী সমাজ কাঠামোই এরজন্য দায়ী। ধর্মের দিক থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও বাংলাদেশের মুসলমান কৃষক, শ্রমিক এবং সাধারণ খেটে খাওয়া মেহনতী মানুষ কী শোষণ-জুলুম, বঞ্চনা-লাঞ্ছনা এবং নিষ্পেষণ থেকে মুক্ত? মোটেও নয়। রাষ্ট্রীয় চরিত্রের কারণেই কেবল মানুষ অধিকার বঞ্চিত অথবা অধিকার প্রাপ্ত হয়ে থাকে, ধর্মের কারণে অদৌ নয়।

সুতরাং বাংলাদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টানসহ সকল উপজাতীয় সম্প্রদায়ের নাগরিকদের একথাটি অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, তারা বিরাজমান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আওতায় সংখ্যালঘু কোনক্রমেই নয়। তারা যদি অধিকারহীন থাকে কিম্বা

www.pathagar.com

নির্যাতীত-নিষ্পেষিত হয়ে থাকে, তাহলে তা কোনক্রমেই এ কারণে নয় যে, যেহেতু তারা সংখ্যালঘু, সেহেতুই তারা অধিকারহীন অথবা নিষ্পেষিত। না, মোটেও তা নয়। সংখ্যালঘু হওয়ার বিষয়টি অর্থহীন এবং একটি মানসিক রোগ। যে কারণে বাংলাদেশের কোটি কোটি গরীব মুসলমান নাগরিক নিষ্পেষিত এবং বঞ্চিত, সেই একই কারণে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টানসহ অন্যান্য সাধারণ মানুষও নিষ্পেষিত এবং বঞ্চিত।

সুতরাং হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান এবং উপজাতীয় নাগরিকদের দুর্ভোগের কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্ম নয়, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রীয় কাঠামো। বাংলাদেশ এখনো যেহেতু ধর্ম ভিত্তিক রাষ্ট্র নয়, সেহেতু নিজেদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠ কিম্বা সংখ্যালঘু ভেবে জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট করার কোন যৌক্তিক কারণই থাকতে পারে না। এ ধরনের ভাবনা-চিন্তা পুঁজিবাদী শাসন-শোষণের জোয়ালকেই কেবল উত্তরোত্তর মজবুত করে তুলবে, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কোন দিনই তাহলে পুঁজির নির্মম শাসন -শোষণ থেকে মুক্ত হতে সক্ষম হবে না।

সুতরাং জাতির মুক্তির প্রয়োজনেই সমস্যা চিহ্নিতকরণ করতে হবে। পুঁজিবাদী শোষণ-শাসনের নির্মমতা থেকে ইসলামী বিপ্লব যদি এদেশের মানুষকে মুক্ত করতে সক্ষম হয় , সক্ষম হয় প্রত্যেকটি মানুষের অধিকার নিশ্চিত করতে, প্রত্যেকটি মানুষের জান-মাল এবং ইজ্জতের নিরাপত্তা দিতে, তাহলে তাতে আপত্তি করারই বা কী আছে? এমন কী অন্য কোন ব্যবস্থাও যদি মানুষকে শোষণ মুক্ত করে মর্যাদার সাথে তার আর্থিক, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক বিকাশের পথকে উন্মুক্ত করে দিতে পারে কিম্বা তেমন দায়িত্ব বহন করার জন্য নিজেদেরকে উপযোগী করে তুলতে পারে, তাতো দেশ ও জাতির জন্য সৌভাগ্যেরই কথা। এতে দুশ্চিন্তা কিম্বা কোন ধরনের 'এলার্জী' বোধ করার কী-ই বা আছে।

জনগণের দায়িত্ব গ্রহণে ইচ্ছুক জননেতাদেরকে উপরোক্ত আলোচনার আলোকেই দিক নির্দেশনা দিতে হবে। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে দেশের সকল নাগরিকের মর্যাদা রক্ষা, জান-মাল রক্ষার নিমিত্তে সর্বস্তরে আত্মরক্ষামূলক ঐক্যবদ্ধ কমিটি গড়ে তোলার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে।

অপরদিকে, আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জনগণকে তাদের নাগরিক অধিকার সম্পর্কে সজাগ-সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। জান-মাল এবং ইজ্জতের নিরাপত্তা লাভের জন্য জনগণ সরকারকে ট্যাক্স প্রদান করে থাকে। এ কারণে সরকারকে বাধ্য করতে হবে জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত

www.pathagar.com

করতে। এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ সরকারকে উচ্ছেদ করার অধিকার জনগণের একটি ন্যায্য অধিকার। যে সরকার আভ্যন্তরীণভাবে জনগণের জান–মাল এবং ইজ্জতের নিরাপত্তা বিধান করতে ব্যর্থতা কিম্বা গাফিলতির পরিচয় দেয়, তেমন সরকার একটি জাতিকে বিদেশী আগ্রাসনের কবল থেকে রক্ষা করবে কিসের জোরে? তাই জনগণের নাগরিক অধিকার রক্ষা করতে অপারগ এবং দেশ ও জাতির স্বাধীনতা–সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতেও অক্ষম একটি সরকারের হাতে দেশ ও জাতির দায়িত্বভার ছেড়ে দিয়ে সচেতন নাগরিক এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কোন্ যুক্তিতে নিশ্চুপ এবং আন্দোলনহীন অবস্থায় জালিয়াত সরকার কর্তৃক আরেকটি নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রতীক্ষায় দিন গুণছে?

জালিয়াত সরকারের অধীনে আরেকটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেই কী জনগণ তাদের কাংখিত লক্ষ্যে পৌঁছিতে সক্ষম হবে? আরেকটি নির্বাচন কী পুঞ্জিভূত সমস্যার সমাধান? অসহায়ভাবে নির্বাচনের প্রতীক্ষায় ঠায় বসে থাকাই কী কেবল রাজনৈতিক নেতৃত্বের দায়িত্ব? তাদের আর কী কিছুই করার নেই? রাজনৈতিক অঙ্গনে আজ এই অসহায়ত্ব কেন? কেন এই বন্ধ্যাত্ব ?

৪। বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃত্বের অসহায়ত্বের কারণ

সমস্যা বিজড়িত বাংলাদেশের সমস্যার সমাধান বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃত্ব কদাচিৎই দিয়েছে, তা সত্ত্বেও বিরোধী নেতৃত্বচিরদিনই জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন কুড়িয়ে এসেছে। বিরোধী নেতৃত্বের উপর থেকে জনগণের শ্রদ্ধা কখনো উবে যায়নি।

ষাটের দশকের সামরিক শাসন আমলে বিরোধী নেতৃত্ব চরমভাবেই অসহায় বোধ করেছে, কিন্তু জনগণের সমর্থন এবং শ্রদ্ধা হারায়নি তখনও। বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃত্বের উপর থেকে আস্থা কখনো এভাবে নিঃশেষ হয়ে যেতে দেখা যায়নি, যা হয়েছে বিগত ৭ বছরের সামরিক শাসন আমলে। এটাই বোধ করি এরশাদের মত একটি দুর্নীতিবাজ এবং অযোগ্য সরকারের সাফল্যের পেছনে অন্যতম কারণ। এটাকে এরশাদ সরকারের সাফল্য বলা হলেও, দেশ ও জাতির জন্য তার এই সাফল্য প্রকৃতপক্ষে অকল্পনীয় সর্বনাশই বটে। এরজন্য দায়ী কে বা কারা?

এরজন্য প্রধানতঃ দায়ী দুধরনের রাজনীতিবিদ। প্রথমটি হচ্ছে তারা, যারা উত্তরাধিকার সূত্রে রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব লাভ করেছেন। ঐ সকল নেতৃত্ব এ সত্যটি বেমালুম ভুলেই গেছেন যে, তাদেরকে দলের উপর চাপানো হয়েছে

www.pathagar.com

নিজ নিজ দলকে কোন্দল এবং ভাঙনের কবল থেকে কোনমতে রক্ষা করে দলকে দিয়ে আন্দোলন নয়, বরং বৃহৎ দলের ভাবমূর্তি কাজে লাগিয়ে সরকারের কাছ থেকে এবং অন্যান্য দেশী-বিদেশী মহলের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা চুটিয়ে আদায় করার স্বার্থেই কেবল। দলের উপর অপরিপক্ক এবং অযোগ্য নেতৃত্ব আরোপ করে তোষামোদ এবং চাটুকারিতার মধ্য দিয়ে নেতৃত্বকে বিভোর করে রাখা, যাতে দলের সৎ এবং জংগী নেতা-কর্মীরা নেতৃত্বের নেক নজরে না থাকতে পারে। এভাবেই দলের মধ্যে সুবিধা ভোগীরা কৌশলে দলের উপর চাপিয়ে দিয়েছে অযোগ্য নেতৃত্ব এবং স্বাভাবিকভাবেই দলকে করে তুলেছে ভীরু এবং চূড়ান্ত কোন আন্দোলনের প্রশ্নে দোদুল্যমান।

এ সুবিধেবাদী মহলটি দলের নেতৃত্বকে আন্দোলন প্রদর্শন না করে প্রদর্শন করে অল্প ক্ষতিতে, কিম্বা বিনা ক্ষতিতে লাভের পথ। তারাই রাজনীতিকে ব্যবসায় পরিণত করেছে। তারাই নেতৃত্বকে বুঝিয়ে বলে যে, সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে আন্দোলন করে কিছুই করা যাবে না। অধিক আন্দোলন করতে গেলে আর একটি 'সামরিক অভ্যুত্থান' হয়ে যেতে পারে। কাল্পনিক সেই 'সামরিক অভ্যুত্থানের' ভয়ে নেতৃত্ব মাঠের আন্দোলনে আর বেশীদূর এগুতে আগ্রহ প্রকাশ করেনা। কাল্পনিক সেই অভ্যুত্থানের ভয়ে দলীয় নেতৃত্ব এ সত্যটি বেমালুম ভুলেই যায় যে, নেতৃত্বের ভীরুতা এবং দোদুল্যমানতার কারণেই তারা ৭ বছর ধরে একটি সামরিক জান্তাকে পিঠে বহন করে চলছে।

একের পর এক যদি সামরিক অভ্যুত্থান হতেই থাকে হোক না, তাই বলে কি জনগণের আন্দোলন সিন্দুকে পুরে রাখতে হবে? উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নেতৃত্ব বাস্তবেই করে চলছে তাই। দলের সৎ এবং জংগী কর্মীদের বুকভরা ইচ্ছা-আবেগ থাকা সত্ত্বেও নেতৃত্বের দুর্বলতার কারণে তারা কাংখিত আন্দোলনে নিজেদেরকে ছুঁড়ে ফেলার সুযোগই পাচ্ছে না। বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃত্বের অসহায়ত্বের প্রথম কারণ হচ্ছে, রাজনৈতিক অঙ্গনে উত্তরাধিকার সূত্রে অপরিপক্ক এবং অযোগ্য নেতৃত্বের আবির্ভাব।

দ্বিতীয় এবং অন্যতম আরেকটি কারণ হচ্ছে ঐ সকল রাজনৈতিক নেতৃত্ব,যারা জনগণের আন্দোলনের সাথে আকস্মিকভাবে বিশ্বাসঘাতকতামূলক ছেদ ঘটিয়ে পর্যায়ক্রমে স্বৈরাচারী সরকারের সহচরী সেজেছে। দাবী-দাওয়া ভিত্তিক আন্দোলন রচনা করে আন্দোলনের বাঁকে বাঁকে ঐ সকল নেতৃবৃন্দ নিতান্ত ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার স্বার্থে হয় সরাসরিভাবে সরকারী দলে যোগদান করে মন্ত্রিত্বসহ বিভিন্ন পদমর্যাদা এবং সুবিধে লুটেছে, না হয় তারা গোপনে সরকারের সাথে আঁতাত করার মধ্য দিয়ে আন্দোলন থেকে সটকে পড়েছে। এ

www.pathagar.com

সকল রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ এক সময় দেশের জনগণ এবং যুব সমাজের কাছে মোটামুটিভাবে সংগ্রামী নেতৃবৃন্দ হিসেবেই সমাদৃত হতো। তাদের বেহায়াপনা, সুবিধেবাদী আচার-আচরণ এ দেশের আন্দোলনমুখী যুবসমাজ এবং জনগণকে দারুণভাবে আশাহত করেছে।

নেতৃত্বের এই দ্বিমুখী চরিত্রের কারণে আন্দোলন মাঠে জমে উঠার পুর্বেই থমকে গেছে এবং এহেন দৃশ্য অবলোকনের মধ্য দিয়ে জনগণ ধীরে ধীরে বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃত্বের উপর থেকে আস্থা হারিয়ে বসেছে। এরফলে সরকার বিরোধী আন্দোলন জনগণের সাহায্য-সহযোগিতা কুড়াতে নিদারুণ দুর্গতির সম্মুখীন হচ্ছে এবং ক্রমশঃই আন্দোলনে সৃষ্টি হয়েছে সীমাহীন অচলাবস্থা। বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃত্বের অসহায়ত্ব এ কারণেই অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে। এই অসহায়ত্বের আরেকটি কারণ হচ্ছে বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিদেশী সাহাযা-সহযোগিতার উপর নির্ভরশীলতা। যে কারণে দেশের রাজনৈতিক নেতারা মুহুর্মুহু ছুটে যায় সুদূর ওয়াশিংটন, মস্কো এবং দিল্লীতে। ছুটে তাদের যেতেই হয়- সূতোর টান রয়েছে যে। এধরনের বিদেশ গমন পুর্বে গোপনে গোপনেই অনুষ্ঠিত হতো। কিন্তু ইদানীং তা প্রায় প্রকাশ্য মহামারীর রূপই ধারণ করে ফেলেছে। কারো কোন রাখ-ঢাক নেই-পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়েই মহাসমারোহে তারা দলে-বলেই সাহায্যকারী দেশ পানে যাত্রা শুরু করেন।

আন্দোলনের মাঠে 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক' সাম্রাজ্যবাদের মুণ্ডু পাত আর বাস্তবে ওয়াশিংটন উপস্থিত হয়ে সেই সাম্রাজ্যবাদের কাছেই ধর্ণা নীতি; জনগণের বুদ্ধি-বিবেচনায় এর গোমর ধরা না পড়লেও, সচেতন রাজনৈতিক কর্মীদের দৃষ্টি এড়াচ্ছে না। নেতৃবৃন্দের সফর এখন প্রতিযোগিতার রূপ নিচ্ছে- মরিয়া হয়ে উঠেছে এরা সাম্রাজ্যবাদ এবং আধিপত্যবাদীদের এজেন্সী গ্রহণ করার জন্য। রাজনীতিতে এর অশুভ ফলাফল ইতিমধ্যেই লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠেছে। জাতির প্রকৃত শত্রুকে এখন আর চিহ্নিত করা যাচ্ছে না। সুতরাং মেরুকরণও ঘটছেনা। সাহায্য-সহযোগিতা দানকারী শক্তিসমূহ প্রায়শঃই তাদের ইচ্ছা এবং খেয়াল খুশী চাপিয়ে দেয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের উপর। এর ফলে সাহায্য গ্রহণকারী নেতৃত্ব স্বেচ্ছায় বাস্তবধর্মী কোন কর্মসূচী গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না অর্থাৎ বিদেশী সাহায্য গ্রহণের ফলে নেতৃত্বের স্বাধীনতা অনেকাংশেই হ্রাস পেয়ে গেছে। চতুর্থতঃ বিরোধী নেতৃত্বের সুবিধেবাদী এবং সন্দেহজনক আচরণের ফলে এককালীন জংগী কর্মী বাহিনীর মধ্যেও জন্ম নিয়েছে সুবিধেবাদ এবং সন্দেহ।

www.pathagar.com

কর্মী বাহিনীর যে অংশটি নেতৃত্বের কাছ থেকে খানিকটা হলেও সুবিধের ভাগ নিচ্ছে, তারা অন্যদের তুলনায় বৈষয়িকভাবে সচল হয়ে উঠলেও আন্দোলনগত দিক থেকে তারা হয়ে পড়েছে অলস এবং বেনিয়াসুলভ।

অপরদিকে, কর্মী বাহিনীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশটি নেতৃত্বের কাছ থেকে বঞ্চিত হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে এবং আন্দোলনের প্রশ্নে তারা হয়ে পড়েছে একেবারেই নিস্পৃহ ও নির্বিকার। একটা অংশ ঝুঁকে পড়েছে বিদেশী সাহায্য সংস্থা পরিচালিত এন, জি, ও –এর ফাঁদে। চাকুরীর জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা অংশ। কিছু কর্মী ব্যবসার উদ্যোগ নিচ্ছে। এক সময়ের দেশপ্রেমিক জংগী কর্মী বাহিনীর বিরাজমান এই দুঃখজনক পরিণতির জন্য দায়ী কোন মহল? সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের আসল উদ্দেশ্যই কী তাহলে সফল হল? দেশপ্রেমিক এবং সৎ বিরোধী নেতৃত্ব এবং কর্মী যে একেবারেই নেই তা নয়। যারা রয়েছেন তারা হাবুডুবু খেয়ে বেড়াচ্ছেন সম্পদের অভাবে। কারণ তারা কোন অবস্থাতেই ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার কথা কল্পনাও করতে পারেন না। সম্পদের লোভে তারা জনস্বার্থ বিসর্জন দিতে কোন অবস্থাতেই প্রস্তুত নয়, ভয়–ভীতিরও কোনরূপ তোয়াক্কা করেন না তারা। এই দেশপ্রেমিক ও সৎ নেতৃত্ব এবং কর্মীদের সংকট ও অসহায়ত্ব সর্বাধিক, কারণ বিভিন্ন উপকরণ এবং উপাদানের তীব্র সংকটের ফলে তারা না পারছেন বলিষ্ঠতার সাথে সম্মুখে অগ্রসর হতে, আর না তারা সক্ষম হচ্ছেন নীরবে আন্দোলনহীন অবস্থায় বসে থাকতে। এহেন অবস্থায় আন্দোলনের মাঠে তাদের উপস্থিতি জনমনে তেমন কোন দাগ কাটে না। ফলে দেশপ্রেমিক এবং সৎ নেতৃত্ব ও কর্মী বাহিনী বলতে যা কিছু রয়েছে তা সরকার সমর্থিত সুবিধেবাদের তীব্র স্রোতের মহড়ায় এক রকম তলিয়ে যাচ্ছে বললেও অত্যুক্তি হবে না।

এদের অসহায়ত্ব বৃদ্ধির আরেকটি কারণ হল যে, রাজনীতিতে সীমাহীন সুবিধেবাদ জন্ম নেয়ার ফলে দেশপ্রেমিক সৎ নেতৃত্ব কর্মী ও জনগণের সন্দেহের উর্ধে থাকতে পারছে না।

দেশপ্রেমিক এবং সৎ নেতৃত্ব সাধারণতঃ অভিমানী এবং স্পর্শকাতর চরিত্রের অধিকারী হয়ে থাকে। তাদের অবস্থানকে তারা কোনক্রমেই চরিত্রহীন এবং সুবিধেভোগী রাজনৈতিক নেতৃত্বের সংগে একীভূত করে দেখতে চায় না।

এ ধরনের কোন প্রচেষ্টা কেউ চালালেই তারা হয়ে ওঠে দারুণ অভিমানী এবং এক পর্যায়ে দায়িত্ব পালনই ছেড়ে দেয়। একথা অনস্বীকার্য যে, বরাবরই

www.pathagar.com

রাজনৈতিক অঙ্গনে সুবিধেবাদী চরিত্রের পাশাপাশি দেশপ্রেমিক, ত্যাগী এবং সৎ নেতৃত্ব বিরাজ করেছে।

সাধারণতঃ সামরিক শাসনের আমলেই সুবিধেবাদী চরিত্রের রাজনৈতিক নেতৃত্বের দাপট এবং কদর বেড়ে যায়। দেশপ্রেমিক, ত্যাগী এবং সৎ নেতৃত্ব সুবিধেভোগীদের বেহায়াপনার মহড়া দেখে শামুকের মতই নিজের মধ্যে কুঁচকে যায়।

সুবিধেবাদী নেতৃত্বের অসহায়ত্ব যে কারণে, দেশপ্রেমিক, ত্যাগী এবং সৎ নেতৃত্বের অসহায়ত্ব সেই একই কারণে নয়। তাদের অসহায়ত্বের কারণ হচ্ছে, রাজনীতিতে সুবিধেবাদের জোয়ার সৃষ্ট শঠতা, প্রতারণা, মিথ্যাচার, নোংরামী, কোন্দল ইত্যাদির কারণে রাজনীতিতে সৎ এবং আদর্শবান কর্মীর সংকট। এর ফলে, দেশপ্রেমিক এবং সৎ নেতৃত্ব সুবিধেবাদ এবং ভূঁইফোঁড় নেতৃত্বের তুলনায় সাংগঠনিক শক্তির দিক দিয়ে অনেক পেছনে পড়ে থাকে। অর্থ-সম্পদের ঘাটতি, সৎ এবং আদর্শ প্রেমিক কর্মীর ঘাটতি পূরণ করে দেশ ও জাতির স্বার্থে একটি আদর্শিক সংগ্রাম রচনা করা তাদের জন্য হয়ে পড়ে দুঃসাধ্য।

অথচ দেশ ও জাতির জন্য প্রয়োজনই হচ্ছে দেশপ্রেমিক, ত্যাগী এবং সৎ নেতৃত্ব। সর্বত্র আলোচনার ক্ষেত্রে সকলেই এ বিষয়ে একমত পোষণ করে যে, দেশ ও জাতির অস্তিত্বের জন্য আজ সর্বাধিক প্রয়োজন আদর্শবাদী ত্যাগী নেতৃত্ব, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই প্রয়োজন পূরণের জন্য তেমন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করতে কাউকেই দেখা যাচ্ছে না।

জাতি আজ কেবল অসুস্থই নয়, সীমাহীন নিরুদ্বেগও বটে। নেতৃত্বের ক্ষেত্রে এই নিদারুণ অসহায়ত্ব এবং শূণ্যতা উপলব্ধি করে কেউ বা যদি কোন নতুন উদ্যোগ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করার আগ্রহ করে, তাহলে তাকে সাথে সাথেই নিরুৎসাহ করে দেয়া হয় এই বলে, 'দেশে এতগুলো রাজনৈতিক দল রয়েছে আবার নতুন করে দলের কী-ই বা এমন প্রয়োজন।'

অপরদিকে সাথে সাথে একথাও শোনা যাচ্ছে যে, 'নাহ! উপস্থিত কোন রাজনৈতিক দল দিয়ে দেশের কোন কাজই হবে না- কেউই দেশ পরিচালনার জন্য যোগ্য নয়।' ভাল কথা। যোগ্য না হলে যোগ্যতা অর্জনের জন্যইতো প্রয়োজন নতুন উদ্যোগ গ্রহণের। কোন নতুন উদ্যোগকেও স্বাগত জানানো হবে না, পুরাতনকেও গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকবনা, তাহলে দেশ ও জাতি কী এভাবেই নেতৃত্বহীন অবস্থায় সামরিক জান্তার খেয়াল-খুশীর পুতুলই থেকে যাবে?

www.pathagar.com

মুল কথাই হচ্ছে, স্বাধীন বাংলাদেশে কোন দেশপ্রেমিক, ত্যাগী, সৎ এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্ব জন্মাতে দেয়া হবে না, এটাই হচ্ছে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী এবং আধিপত্যবাদী গোষ্ঠীর নীলনক্শা। তারা চায় না কোন দেশপ্রেমিক, সৎ এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্ব বাংলাদেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করুক। সে রকম কিছু হয়ে গেলে বিদেশীদের ষড়যন্ত্র এই স্বাধীন মাটিতে কখনই আর কার্যকর করতে দেয়া হবে না। এর ফলে তাদের উৎপাদনজাত পণ্যের বাজার বিনষ্ট হয়ে যাবে, বাংলাদেশ সরকারের উপর থেকে তাদের অবৈধ প্রভাব বিলুপ্ত হবে এবং বাংলাদেশ স্বাধীনভাবে বিকাশ লাভের মধ্য দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে। তখন বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের ইংগিতে বাংলাদেশে রাতের অন্ধকারে মূহুর্মূহু সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানোও আর সম্ভবপর হয়ে উঠবে না। বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষা, বাংলাদেশের উত্তরোত্তর বিকাশ এবং উন্নতিতো প্রত্যেক বাংলাদেশীরই কাম্য।

তাহলে এখানে নেতৃত্বের অসহায়ত্ব কাটিয়ে দেশপ্রেমিক, ত্যাগী এবং সৎ নেতৃত্ব-এর লালন, বিকাশ এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্ব সুসংহত করার লক্ষ্যে সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না কেন? পূর্বের আলোচনা থেকেই এ কথা পরিষ্কার যে, বাইরের থেকে কেউই একাজে আমাদেরকে সহায়তা প্রদান করবে না। দেশ ও জাতির অভ্যন্তর থেকেই নিজেদের একান্ত গরজেই নেতৃত্ব সৃষ্টির উদ্যোগটি আমাদেরকেগ্রহণ করতে হবে।

এই গুরুদায়িত্ব পালনে আমাদের শৈথিল্য এবং ব্যর্থতা যতদিন অব্যাহত থাকবে, ততদিন পর্যন্ত রাজনৈতিক নেতৃত্বের অসহায়ত্ব দূর হবে না এবং দেশ ও জাতির উপর থেকে সামরিক কর্তৃত্বেরও অবসান ঘটবেনা।

দেশ ও জাতির উপরে দীর্ঘমেয়াদী সামরিক কর্তৃত্ব জাতীয় জীবনের সকল মূল্যবোধে ঘুণ ধরিয়ে দেয়, সমাজ দেহে ধরায় পচন এবং কালক্রমে জাতিকে চেতনার দিক থেকে মৃতবৎ করে তোলে। বিগত ৭ বছরের বেসামরিক খোলসে সামরিক শাসনের কলংকজনক ইতিহাস আমাদের সকলেরই চোখের সম্মুখে। ইতিমধ্যেই মানি ব্যক্তি মান হারিয়েছে, ঘাট হয়েছে অঘাট এবং অঘাট হয়েছে ঘাট। সামরিক শাসন মেনে নেয়ার অর্থই হচ্ছে স্বাধীনতা বিরোধী চেতনাকে স্বীকৃতি দেয়া।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মূলেই ছিল সামরিক শাসন বিরোধী চেতনা। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে সামরিক শাসনের সম্পর্ক বৈরী। সামরিক শাসনের সাথে সহযোগিতা করা কেবল যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থী তাই-ই নয়, সামরিক শাসনের সহযোগিতার অর্থই হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা। জাতির

www.pathagar.com

বিশেষ কোন ক্রান্তিলগ্নে সামরিক শাসন দেশ ও জাতির নিরাপত্তা রক্ষার জন্য বিশেষ ভূমিকা পালনে অবতীর্ণ হতে পারে, তবে তা সাময়িকভাবেই কেবল। সেই বিশেষ ক্রান্তিকালের অবসানের সাথে সাথেই সামরিক শাসনেরও অবসান হওয়া উচিত। স্থায়ীভাবে দেশ ও জাতির উপর সামরিক কর্তৃত্ব বহাল রাখার প্রচেষ্টার সাথে কোন রকম সহযোগিতা প্রদান করার অর্থই হচ্ছে জনগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়া।

যে সকল সামাজিক এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব সামরিক কর্তৃত্বের পক্ষপাতিত্ব করেছে তাদেরকে স্থায়ীভাবেই চিহ্নিত করে রাখা প্রয়োজন। যুগ যুগের শোষণ-বঞ্চনা থেকে মুক্ত হয়ে বাঙালী জাতির প্রথম স্বাধীনতা ভোগ স্রেফ কতিপয় নেতৃত্বের লাম্পট্য এবং অযোগ্যতার কারণে স্বাধীনতা পুনরায় পরাধীনতায় রূপান্তরিত হোক এটাই কী ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে প্রাপ্ত স্বাধীনতা চাওয়া?

কতিপয় ক্ষমতালোভী, দুর্নীতিবাজ সামরিক অফিসারের মর্জি দেশ ও জাতির উপর প্রয়োগ হতে থাকবে, আর অসহায়ের মত ১১ কোটি মানুষ তাদের রঙ্গ-লীলার শিকার হবে এটাই কী একটি স্বাধীন জাতির প্রাপ্য? দেশ ও জাতিকে অসহায়ত্বের কোটরে আটকে রেখে যারা নিজেদের ভোগ-লালসা পূরণের জন্য সবরকম সুবিধে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করতে থাকবে, তারা কোনক্রমেই জাতির মঙ্গলাকাংখী হতে পারে না। তাদেরকে দেশ ও জাতির শত্রু হিসেবেই চিহ্নিত করতে হবে. এবং তাদের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে জাতির মধ্যে অপরাধপ্রবণতা বন্ধ করা যাবে না।

দেশের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব বহনকারী শক্তি দেশ ও জাতির পবিত্র আমানত। কতিপয় ক্ষমতালোভী সামরিক অফিসারের কারণে এই পবিত্র আমানতের খেয়ানত সাধন সকল বিচারের মানদণ্ডেই অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য হওয়া উচিত।

প্রতিরক্ষা বাহিনী দেশ ও জাতির গর্ব ও গৌরব হিসেবে বিবেচিত হওয়ার পরিবর্তে তারাই হবে দেশ ও জাতির ধ্বংসের অন্যতম কারণ তা কোন মতেই মেনে নেয়া যায় না। যারা প্রতিরক্ষা বাহিনীর রাজনীতিতে সরাসরি অংশ গ্রহণের পক্ষে ওকালতী করে বেড়ায়, তারা তা করে প্রতিরক্ষা বাহিনীকে ভালবেসে নয় বরং তারা করে তাদের শয়তানী স্বার্থ হাসিল করার জন্যই কেবল। তাদের দুরভিসন্ধি অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। প্রতিরক্ষা বাহিনীকে রাজনীতিতে টেনে এনে তারা প্রকৃতপক্ষে প্রতিরক্ষা বাহিনীকে দুর্নীতির পংকে নিমজ্জিত করতে চায় এবং এভাবে প্রতিরক্ষা

www.pathagar.com

বাহিনীকে তার ঐতিহ্যবাহী নিয়ম-শৃংখলা থেকে ধীরে ধীরে সরে যাবে এবং তাহলেই তারা ধ্বংসের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং প্রতিরক্ষা বাহিনীর যারা পক্ষপাতিত্ব করে ঐসকল রাজনৈতিক মহল দেশের জনগণ থেকে মূলতঃ বিচ্ছিন্ন এবং জনধিকৃত। এরা দেশের জনগণেরও শত্রু, প্রতিরক্ষা বাহিনীরও শত্রু। এদের সম্পর্কে প্রতিরক্ষ্য বাহিনীকে সতর্ক থাকতে হবে।

অপরদিকে প্রতিরক্ষা বাহিনীর দেশপ্রেমিক অফিসার এবং সাধারণ সদস্যদেরকে প্রতিরক্ষা বাহিনীর ঐতিহ্যবাহী নিয়ম-শৃংখলা, গর্ব-গৌরব এবং ভাবমূর্তি রক্ষা করার জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হতেই হবে। অন্যথায় কতিপয় অফিসারের লোভ-লালসার কারণে সমগ্র প্রতিরক্ষা বাহিনীই কালক্রমে বঞ্চিত জনতার রুদ্র-রোষে পতিত হলে তাতে বিস্ময়ের কিছুই থাকবে না। একটি স্বাধীন জাতির প্রতিরক্ষা বাহিনীর চরিত্রে উপনিবেশিক উপাদান বিদ্যমান থাকার অর্থই হচ্ছে সেটি একটি ভাড়াটে বাহিনী হিসেবেই থেকে যাওয়া এবং কোন ভাড়াটে বাহিনী একটি স্বাধীন জাতির স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে অক্ষম। এখানে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার আওতায় প্রতিরক্ষা বাহিনী বিশেষভাবেই নিয়োজিত থাকে সাম্রাজ্যবাদী লগ্নি পুঁজি রক্ষা করার শেষ রক্ষাকবচ হিসেবে, সাধারণ জনগণের স্বার্থে নয়। স্বাধীন দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর অফিসার এবং সাধারণ সদস্যরা মন-মেজাজের দিক দিয়ে গণমুখী হলেও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তারা পুঁজি এবং পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষার কাজেই বাধ্য থাকে। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় দেশের কোটি কোটি বঞ্চিত অবহেলিত মানুষ বাঁচার তাকিদেই পুঁজির কঠোর শোষণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে রাস্তায় উত্তেজনামূলক আন্দোলনে নেমে যাওয়ার অর্থ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা নয়। এর অর্থ হচ্ছে, পুঁজির শোষণ থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের ন্যায্য অধিকা প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস মাত্র। এই পদ্ধতির মাধ্যমেই অধিকার বঞ্চিত মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়ে সামাজিক শক্তি সমূহের বিকাশ ঘটতে থাকে, জনগণ অধিকার সচেতন হয়ে ওঠে এবং ধীরে ধীরে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। জনগণের সংগ্রামের পথ রুদ্ধ করে দেয়া হলে তাতে কেবল মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদেরই সুবিধে বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভোগান্তি পৌঁছে যায় চরমে। সামরিক শাসন প্রবর্তন করার মধ্য দিয়ে এ কাজটিই কেবল পাকাপোক্ত হয়। সামরিক শাসন প্রবর্তন জনগণের উদ্দেশে কোন সেবা নয়, নয় জনস্বার্থ পালনের কোন পবিত্র দায়িত্ব। সামরিক শাসনের লক্ষ্যই হচ্ছে স্থানীয় পুঁজিপতি শ্রেণীর পুঁজি রক্ষা করার মধ্য দিয়ে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী কর্তৃক নিয়োজিত ব্যবসায়িক এবং লগ্নি পুঁজির হেফাজত করা। যে পুঁজির লক্ষ্য হচ্ছে জনস্বার্থ

www.pathagar.com

পরিপন্থী। প্রকারান্তরে সামরিক শাসন জনস্বার্থ বিরোধী পুঁজিরই রক্ষক হিসেবে আবির্ভূত হয়।

যারা সামরিক শাসন প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে দেশ ও জাতির সেবা করতে চান তাদের আবেগ এবং দেশপ্রেমের তারিফ করা যেতে পারে, তবে যে পদ্ধতিটির মাধ্যমে তারা দেশ ও জাতির সেবা করতে চান সে পদ্ধতিটি হচ্ছে 'লম্বা আস্তিনের মধ্যে লুক্কায়িত একটি বিষাক্ত চাকু' যা ঐ সকল মহৎ সেবাকারীদের অজান্তেই জাতির বুকে-পৃষ্ঠে বিঁধে যায় এবং জাতীয় দেহের অভ্যন্তরেই রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে যায়। জাতীয় দেহের অভ্যন্তরে রক্তক্ষরণের করুণ দৃশ্যটা তাদের চোখে ধরা না পড়াটাই অতি স্বাভাবিক, কারণ সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী এবং তাদের এদেশীয় পুঁজিপতি মহল সামরিক কর্মকর্তারাদের বুকে জাগিয়ে তোলে দেশরক্ষা এবং জাতি গড়ার স্বপ্ন, চোখে পরিয়ে দেয় শহর পরিচ্ছন্ন করার রঙিন গ্লাস।

সাম্রাজ্যবাদী এই রঙিন গ্লাসে কোটি কোটি ভুখা-নাঙা মানুষের পোড় খাওয়া চেহারাগুলো দেখা না গেলেও শহরের রাস্তা-ঘাটের ময়লা, রাস্তা-ঘাটের অপ্রশস্ততা, ভাঙা কালভার্ট ইত্যাদি 'ফোর হ্যাণ্ড' চোখে পড়ে যায় এবং ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে অন্ন, মুমূর্ষু রোগীকে ওষুধ এবং অশিক্ষিতদের শিক্ষা দেবার পূর্বেই শুরু হয়ে যায় অপরিচ্ছন্ন রাস্তা-ঘাট পরিচ্ছন্ন করার বেজায় উদ্যোগ, ভাঙা কালভার্ট তৈরী এবং মেরামতের তৎপরতা এবং শহরের শ্রী বৃদ্ধি করারা জন্য পার্ক, লেক, ফোয়ারা নির্মাণ, রাস্তায় রাস্তায় নিয়ন বাতি লটকিয়ে দেয়ার ধুমধাম প্রতিযোগিতা। বিভিন্ন সময় জাঁকজমকপূর্ণ সামরিক কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান, ঘন ঘন সামরিক কনফারেন্স, বিদেশ থেকে আগত রাষ্ট্রীয় অতিথিদের উদ্দেশে ঘন ঘন ভোজ সভার আয়োজন ইত্যাদির মধ্যে মহাব্যস্ত হয়ে ওঠেন বুভুক্ষু দেশের জনসেবাকারী সামরিক কর্তাব্যক্তিবর্গ। ক্ষুধার ভারে নুয়ে পড়া কোটি কোটি কৃষক, কারখানার অর্ধভুক্ত রোগা শ্রমিক, সরকারী-বেসরকারী অফিসের লক্ষ লক্ষ ছা-পোষা কর্মচারী, লক্ষ লক্ষ বেকার, লক্ষ লক্ষ জেলে, তাঁতী এবং লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা মানুষের সমস্যা এবং দুঃখের কাহিনী শোনার সময় কোথায়? ওসব শুনতে গেলে কী আর দেশ সেবা করা যাবে? সামরিক শাসনের দেশ সেবার এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের মধ্য দিয়েই আগামী দিনের দেশ সেবকদের মন খানিকটা আলোকিত হলে দেশ ও জাতির ভোগান্তির অবসান না হলেও স্বস্তির নব সূচনা হতে পারে।

www.pathagar.com

৫। স্বাধীন জাতিসত্তা বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতা

এ কথা সত্য যে, ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে সর্বপ্রথম বাঙালী জাতি স্বাধীন জাতিসত্তা হিসেবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেছে। এর পূর্বের ইতিহাস দাসত্বের ইতিহাস–পরাধীনতার ইতিহাস। সে ইতিহাস রচিত হয়েছে আমাদের রক্তে, অশ্রুতে, লজ্জা এবং কলংকে। সেখানে আমাদের কোন গর্ব নেই, নেই কোন গৌরব। পিতার হাতে পুত্র খুন, মায়ের হাতে মেয়ে খুন, ভাইয়ের হাতে ভাই খুন, ঘরে আগুন, বাইরে আগুন তখন আমরা ছিলাম বহিরাগত বিজয়ীদের হাতের ক্রীড়নক, তামাসার বস্তুই কেবল। অনেক রক্ত স্রোতের পরে ইতিহাসে পালা বদল হল।

স্বাধীনতা অর্জন করলাম আমরা। পেলাম দেশ শাসন করার অধিকার। বাঙালীর সন্তান দেশ শাসন করবে এরচেয়ে বড় সৌভাগ্যের কথা আর কী–ই বা হতে পারে?

সেই পরম সৌভাগ্য নিয়েই ১৯৭২ সনে শুরু হল দেশ শাসন। সকলের চোখে–মুখে নতুন স্বপ্ন —দেশ গড়ার আবেগ ও উত্তেজনা। "স্বাধীনতা পেয়েছি" মুখে বলতে শিখলাম, অন্তরে এর তাৎপর্য অনুভব করতে শিখলাম কি–না জানিনা।

তাই একটি স্বাধীন জাতিসত্তা হিসেবে বিকাশের পথে প্রথম প্রতিবন্ধক রূপে যে দিকটি লক্ষ্য করা গেল তা হচ্ছে স্বাধীনতার অর্থ এবং তাৎপর্য সম্পর্কে জাতিগতভাবেই আমাদের দূরন্ত অজ্ঞতা। এই অজ্ঞতার ফলে একটি স্বাধীন জাতির শাসক এবং শাসিত–এর মধ্যকার যে সম্পর্ক গড়ে ওঠা বাঞ্ছনীয় ছিল তা গড়েতো ওঠেইনি, বরং পূর্বেকার সেই পরাধীন জাতির সকল দোষ–ত্রুটিই হঠাৎ করে যেন অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায়ও হিংস্রতর হয়ে উঠল। উপনিবেশিক আচার–আচরণ অক্ষুণ্ন রেখে স্বাধীন জাতিসত্তা বিকাশের স্বপ্ন মুকুলিত হতে পারেনা বলেই স্বাধীনতার ১৮ বছরের মধ্যে আমাদের স্বাধীন জাতিসত্তা বিকাশের পথে বিভিন্নমূখী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে এবং সজ্ঞানেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। ব্যক্তি ভোগ–লালসা পূর্ণ করার জ্ঞানহীন প্রতিযোগিতা কিছু লোককে স্বাধীনতার ফসল ভোগ করতে শিখালেও জাতিসত্তা বিকাশের পথে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে এক অপ্রতিরোধ্য প্রতিবন্ধক। তাদের ভোগের সীমা অতিক্রম পরিণত হয়েছে সর্বনাশা অপরাধে। দেশ গঠনের পূর্বে ভোগ–লালসা পূরণের সীমাহীন প্রতিযোগিতা স্বাধীন জাতিসত্তা বিকাশের পথে যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তা জাতিকে অংকুরেই বিনাশ করে দিতে সক্ষম এবং বিরাজমান পরিবেশ ও পরিস্থিতি সেই সর্বনাশা চিত্রেরই বহিঃপ্রকাশ। স্বাধীন জাতিসত্তা বিকাশ পর্বে জাতিকে যে কৃচ্ছতা এবং

www.pathagar.com

ত্যাগের উদাহরণ রাখতে হয় জাতিগতভাবে আমরা সেদিক থেকে সম্পূর্ণভাবেই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছি। এই ব্যর্থতা স্বাধীনতার অর্থ এবং তাৎপর্য সম্পর্কে অজ্ঞতাপ্রসূত ব্যর্থতা। এ ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠা সম্ভব, যদি জাতি এখনও কৃচ্ছতা সাধনের পথে ব্রতী হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়তঃ যে প্রতিবন্ধকতাটি বিশেষভাবেই লক্ষ্যণীয় তা হচ্ছে, আমাদের জাতীয় জীবনের সাংস্কৃতিক বিভ্রাট। পোশাক-আশাক, খাওয়া-দাওয়া এবং ভাষাগত দিক দিয়ে বাঙালীরা এক হলেও মন-মানসিকতার দিক থেকে বিভিন্ন। আমরা কেউ বাঙালী, কেউ বাংলাদেশী আবার কেউ বা মৌলবাদী মুসলমান।

সকল ইসলামপন্থীদেরকে সাম্প্রদায়িক এবং মৌলবাদের সংগে একীভূত করা হয়েছে। অপরদিকে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণার ধারকরা ধর্মকে জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণার সংগেই গুলিয়ে ফেলেছে, তবে তারা মৌলবাদী মুসলমান হিসেবে চিহ্নিত হতে নারাজ, কিন্তু দৃশ্যতঃ ধর্মকাতর।

বাঙালী জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণার বাহকরা ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ধর্মহীনতার পৃষ্ঠপোষক। স্বাধীনতা উত্তর রাষ্ট্রীয় শাসন ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ধর্মহীনতার মিশ্রণে 'বাঙালী জাতীয়তাবাদী' লেবেলে শুরু হলে ধর্মপন্থীরা একেবারেই কোণঠাঁসা হয়ে পড়ে। এখান থেকেই প্রকাশ্যভাবে বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক সংকট নতুনভাবে তীব্রতা লাভ করে।

১৯৭৫ সনের ১৫ই আগষ্টের পরিবর্তনের পর শুরু হল 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী শাসন আমল। উভয় আমলেই প্রকৃত ধর্মপ্রাণ জনগোষ্ঠী অস্বস্তি বোধ করেছে। খেটে খাওয়া মেহনতী গোষ্ঠীর মানুষ ধর্ম নিয়ে বিশেষ মাথা না ঘামালেও সরাসরি ধর্মের বিরোধিতা পছন্দ করে না।

ইসলামপন্থী অথবা মৌলবাদী মহল দেশে ইসলামী শাসন প্রবর্তনের পক্ষে জোরেসোরে কর্মতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। জনগণ ইসলামী শাসন এখন পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করেনি, তবে ইদানীং জনগণের বিরাট একটা অংশের মন্তব্য হচ্ছে যে, দেশে একটা 'খোমেনী ষ্টাইলের বিপ্লব' আবশ্যক। তাদের ধারণা, খোমেনীর ইসলামী বিপ্লব ইরানে সকল দুর্নীতি, অপরাধ, শোষণ-জুলুম এবং বিদেশী প্রভাবের যেভাবে অবসান ঘটিয়েছে বাংলাদেশেও তেমন একটি বিপ্লব সংগঠিত হলে হয়ত বা দেশে শান্তি-শৃংখলা ফিরে আসবে। অর্থাৎ জনগণের স্বপ্নে রয়েছে একটি আমূল পরিবর্তনের প্রত্যাশা। তাদের প্রত্যাশায় ইসলাম পালনের অঙ্গীকার কতটুকু রয়েছে তা এখনো বুঝে ওঠা মুশকিল। সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীর এই

www.pathagar.com

পার্থক্য এবং বিভ্রাট বাঙালীর স্বাধীন জাতিসত্তা বিকাশের পথে অন্তরায়। এর একটা যুক্তিযুক্ত সুরাহা প্রয়োজন।

তৃতীয়তঃ স্বাধীন জাতিসত্তা বিকাশের পথে অপর যে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা হচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি এবং পশ্চিমা সংস্কৃতির উপর উত্তরোত্তর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি। এ দুয়ের উপরেই রয়েছে শাসক সামরিক এবং বেসামরিক আমলা মহলের প্রচণ্ড দুর্বলতা। এর ফলে বাংলাদেশের মত নব্য স্বাধীন দেশে স্বাধীন জাতিসত্তা বিকাশের স্বার্থে কোনরূপ সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সকল পর্যায়েরই পরিপন্থীমূলক কর্মতৎপতা অব্যাহত রাখার জন্য সক্রিয় সমর্থন যুগিয়ে যাচ্ছে শাসক সামরিক এবং বেসামরিক আমলামহল।

চতুর্থতঃ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মোড়লীপনা সম্পন্ন চক্রান্ত কোনক্রমেই চাচ্ছেনা বাংলাদেশে স্বাধীন সত্তার বিকাশ ঘটুক। তাদের এ চক্রান্ত আজকের নয়। সেই ১৯৪৭ সনের ভারত বিভক্তির পূর্ব মুহূর্ত থেকেই ঐ দুষ্টু চক্র বাঙালী জাতিসত্তার স্বাধীন বিকাশের বিরোধী। এই একই কারণে তারা ভারত বিভক্তির শেষ মুহূর্তে আকস্মিকভাবেই বাঙলাকে বিভক্ত করে ফেলে পূর্ব এবং পশ্চিম বাঙলা হিসেবে। উদ্দেশ্যটা নিশ্চয়ই মহৎ ছিল না। বাঙালী জাতি বিভক্ত অবস্থায় কোনদিনই স্বাধীন জাতিসত্তা হিসেবে বিকাশ লাভে সক্ষম হবে না এই ছিল ঐ প্রতিক্রিয়াশীল ভারতীয় শাসক চক্রের হিসেব।

কিন্তু বিলম্বে হলেও বাঙালীরা সেই চক্রান্তের দীর্ঘ সাড়ে তেইশ বছর পর পাকিস্তানী শাসক চক্রের আরেক ফাঁদ থেকে মুক্ত হয়ে ভারত এবং পাকিস্তান উভয়েরই ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে একটি স্বাধীন জাতিসত্তার ভাবমূর্তি নিয়ে বিকাশ লাভের পথ বেয়ে চলেছে। ভারতীয় উপমহাদেশে বাঙালীরা প্রথম জাতি যারা নিজ ভাগ্য গড়ার ক্ষমতা অর্জন করেছে, কিন্তু ক্ষমতা লাভের সাথে সাথেই প্রয়োজন ক্ষমতা রক্ষা করার ইচ্ছা এবং যোগ্যতা অর্জন। বৃহৎ প্রতিবেশী আমাদেরকে যোগ্যতা অর্জনের সেই সুযোগ দেবেই বা কেন?

বৃহৎ প্রতিবেশী আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে আজ পর্যন্ত আকার-ইংগিতে, ছলে-বলে এবং তাদের সকল কার্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে এ কথাই বুঝিয়ে দিতে চাচ্ছে যে, বাংলাদেশ স্বাধীনভাবে বিকশিত না হয়ে তারই বশীভূত অথবা কৃপামূখী হয়ে থাক, যেমন আছে ভুটান, সিকিম, কাশ্মীর। বৃহৎ প্রতিবেশী এরূপ হলে খুশী। এর অন্যথায় বাংলাদেশকে

www.pathagar.com

শ্রীলংকার পরিণতি বরণ করতে বাধ্য করা হবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতাই কেবল সংকটাপন্ন হবে না, বাংলাদেশের অবস্থান হবে প্রতিবেশীর জঠরেই।

বাংলাদেশের সচেতন মহলের বেশ একটা অংশও উপরোক্ত মত পোষণ এবং প্রকাশ করা শুরু করে দিয়েছে ইতিমধ্যেই। তারা প্রকাশ্যেই মন্তব্য করে বেড়াচ্ছে যে, বৃহৎ প্রতিবেশী আগ্রাসন চালালে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী নাকি তাদেরকে কোনরূপ বাধাই প্রদান করবে না। প্রতিবেশী ভারতের গোয়েন্দা বাহিনী 'র' (R.A.W) নাকি ইতিমধ্যেই নানান গোপন সুযোগ-সুবিধে প্রদানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ সকল অফিসারকে হাত করে নিয়েছে। সত্যিই ভয়ংকর কথা। দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী শেষ পর্যন্ত ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনী 'র' (R.A.W)-এর দখলে চলে গেল।

খবরটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে একটা কুৎসা হোক- হোক একটা সাজানো অপবাদ তবুও ভাল। কিন্তু খবর যা রটেছে তা যদি সত্যিই হয়ে থাকে তাহলে বাংলাদেশের একটি স্বাধীন জাতিসত্তা হিসাবে বিকাশ লাভের আর অবকাশই বা কোথায় রইলো! উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তারা কী তাহলে বাংলাদেশের স্বাধীন জাতিসত্তার বিকাশ কামনা করে না? এহেন অবস্থায় একটি জাতির স্বাধীন বিকাশ ঘটানো সুকঠিন কাজই বটে।

প্রতিবেশী ভারত আরো নানানভাবে বাংলাদেশকে বিব্রত করে তুলেছে। একদিকে পার্বত্য অঞ্চলে 'শান্তি বাহিনী' সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মাটিতে রক্ত ঝরিয়েই চলছে এবং স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের প্রতি একটি প্রকাশ্যে হুমকি জিইয়ে রেখেছে। অপরদিকে 'কাদেরীয়া বাহিনী'কে ভারতের মাটিতে দীর্ঘ ১৪টি বছর ধরে পুষে পুষে প্রকাশ্যেই বাংলাদেশের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয়ে সাহায্য করে যাচ্ছে ভারত।

লোক মুখে যদিও শোনা যাচ্ছে যে, বাংলার বীর দামাল সন্তান প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা জনাব কাদের সিদ্দিকী নাকি নিজ দেশের বিরুদ্ধে কোন ক্ষতিজনক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে আদৌ প্রস্তুত নন, উপরন্তু তিনি নাকি ইসলামের দিকেই ঝুঁকে পড়েছেন। তাই হোক। দেশের বীর সন্তান দেশের বিরুদ্ধে লড়তে যাবে কোন যুক্তিতে? তবুও দেশবাসীর মনের শংকাতো দূর হচ্ছে না, যতদিন স্বয়ং বীর যোদ্ধা কাদের সিদ্দিকীর তরফ থেকে দেশবাসীর কাছে কোন আশ্বাসবাণী না পৌঁছে।

প্রতিবেশী ভারতের এরপর রয়েছে তালপট্টি দ্বীপ দখল করে রাখা, অঙ্গুরপোতা-দহগ্রাম ছিটমহল এবং করিডোর দখল করে রাখা, ভারত-বাংলাদেশের

www.pathagar.com

বিভিন্ন সীমান্তে মুহুর্মুহু সংঘর্ষ অব্যাহত রাখা, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মিথ্যে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ তুলে বাংলাদেশী সরকারকে অপদস্ত এবং হয়রানি করা থেকে শুরু করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরিবর্তনের পেছনেও নাকি রয়েছে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের 'ডিকটেশান'। এরপরতো রয়েছে সীমান্ত দিয়ে চোরাকারবারীদের অভিযান। প্রতিবেশী ভারত পরিকল্পিতভাবেই নাকী চোরাকারবারীদেরকে বাংলাদেশের সীমান্তে অবৈধ কর্মটি বৈধকরণ করে দিয়েছে যাতে ভারতীয় চোরাকারবারী মহল ব্যবসা–বাণিজ্য এবং শিল্প বিস্তারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বাধা–বিঘ্ন ঘটিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

এরপর রয়েছে ভারতীয় সংস্কৃতির ব্যাপক অনুপ্রবেশ, যার ফলে বাংলাদেশের সংস্কৃতির স্বাধীন বিকাশ দারুণভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সর্বশেষ চালটি হচ্ছে 'স্বাধীন বঙ্গভূমি' সৃষ্টির পাঁয়তারাটি। বাংলাদেশের দক্ষিণ এবং উত্তর অঞ্চলের কয়েকটি জেলাকে 'বঙ্গভূমি' নামকরণ করে নতুনভাবে মুক্ত করার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করিয়ে দিয়েছে ভারতীয় চক্র।

স্বাধীন বাংলাদেশে 'স্বাধীন বঙ্গভূমি' সৃষ্টির আন্দোলনটি নিঃসন্দেহে একটি প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত এবং আমাদের স্বাধীন জাতিসত্তা বিকাশের পথে একটি মারাত্মক হুমকি।

বৃহৎ প্রতিবেশী নেপালের প্রতি সাম্প্রতিক আচরণটি কেবল নেপালের স্বাধীন জাতিসত্তার প্রতিই হুমকি স্বরূপ নয়, বরং এ হুমকি বাংলাদেশসহ অত্র অঞ্চলের সকল জাতিসত্তার বিরুদ্ধেই একটি সর্বশেষ ইংগিত। ভারত আঞ্চলিক "সুপার পাওয়ার" হিসেবেই যে আত্মপ্রকাশ করার বাসনা পোষণ করে, নেপালের সাথে ভারতের বৈরী আচরণ সেই কুবাসনারই বহিঃপ্রকাশ। এহেন প্রতিকূলতা এবং প্রতিবন্ধকতার মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীন জাতিসত্তা হিসেবে বিকাশ লাভের সম্ভাবনা ধুলোয় লুটে যাবে, যদি না দেশ ও জাতির রাজনৈতিক নেতৃত্ব উপরোক্ত আলোচনার আলোকে জাতিকে দিক–দর্শন প্রদান করতে সক্ষম হন।

সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভংগী পরিচ্ছন্ন না করে নেতৃত্বের পক্ষে বাংলাদেশকে স্বাধীন সত্তা হিসেবে বিকশিত করার সকল উদ্যোগই ভণ্ডুল হতে বাধ্য। একটি জাতির সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক চেতনাই হচ্ছে সকল অগ্রগতি এবং জাতি হিসেবে বিকশিত হওয়ার প্রথম এবং প্রধান শর্ত।

যারা বাংলাদেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে আগ্রহী তাদেরকে বিরাজমান সাংস্কৃতিক বিভ্রাট হ্রাস করে এনে যুক্তিযুক্ত একটা মতামতে অবশ্যই পৌঁছতে

www.pathagar.com

হবে। অন্যথায়, এর পরিণতি দেশ ও জাতির অস্তিত্ব বিলীন হওয়ার সমকক্ষ হয়ে গেলেও আমি বিস্মিত হব না।

৬। বাংলাদেশে কার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে?

ভারতের, আমেরিকার না বাংলাদেশীদের?

জন্মলগ্ন থেকেই নব্য স্বাধীন বাংলাদেশকে নিয়ে আন্তর্জাতিক কূটচক্রান্ত অব্যাহত রয়েছে। ১৯৭১ সনের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীন উত্থান হওয়াতে মার্কিনী শক্তি আন্তর্জাতিক স্ট্রাটেজীতে যে চড় খেয়ে যায় তার শোধ নিতে গিয়ে মার্কিনী লবী পাক-ভারত উপমহাদেশীয় অঞ্চলে পূর্বের তুলনায় অনেক গুণে তাদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়। নিক্সন-কিসিঞ্জার চক্র আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ধুরন্ধরতার পরিচয় দিতে সক্ষম হলেও বাঙালী জাতির জাতীয়তাবাদী আবেগ ও অনুভূতি নিরূপণ করার ক্ষেত্রে অপরিপক্কতার পরিচয় দিয়েছে। এক্ষেত্রে বাঙালীরা আশাতীত সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে।

কিন্তু স্বাধীনতা উত্তরকালে স্বাধীন বাঙালীর আবেগ-অনুভূতিতে যে হারে ভাটা ধরেছে তাতে যে কোন ষড়যন্ত্রকারীদের পক্ষেই বাংলাদেশে একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটিয়ে দেয়া মোটেই দুঃসাধ্য ছিল না। এরজন্য প্রধানতঃ দায়ী স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার এবং সরকার প্রধান মরহুম জননেতা জনাব শেখ মুজিবর রহমান, যিনি তাঁর দলীয় স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার দিকটি বেমালুম উপেক্ষা করে গেলেন। এই সূবর্ণ সুযোগটিই ছিনিয়ে নিয়েছে পরাজিত মার্কিনী লবী। প্রতিশোধ গ্রহণের নেশায় যে মার্কিনী লবী হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তারা অতি সহজেই বাংলাদেশের খুঁটি নাড়ার সুযোগ লাভ করল। শেখ মুজিবকে ধন্যবাদ। তিনি তাঁর পুরনো প্রভুদের সাথে নিমকহারামী করেননি।

মার্কিনী লবী এভাবেই ধীরে ধীরে বিভিন্ন সাহায্য সংস্থার নামে প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে নানানভাবেই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ষড়যন্ত্রের জাল বিছানো শুরু করে দেয়। প্রথম অবস্থায় তো অনেকেরই ধারণা ছিল যে, মার্কিনী লবীর সক্রিয় সাহায্য-সহযোগিতায় স্বাধীন বাংলাদেশকে পুনরায় পাকিস্তানের সাথে একত্রীকরণ করার গোপন তৎপরতা চলছে 'মুসলিম বাংলা' আন্দোলনের আড়ালে। 'মুসলিম বাংলা' গঠনের আদৌ কোন আন্দোলন ছিল কি-না সে তথ্য আমার জানা নেই। তবে সুদূর লণ্ডন থেকে প্রকাশিত সংগ্রাম নামে একটি বাংলা

www.pathagar.com

পত্রিকায় 'মুসলিম বাংলা' বিষয়ক কিছু সংবাদ আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। স্বাধীন বাংলাদেশেও বিভিন্ন জায়গাতে বেশ কিছু লোকজনকেও মুজিব সরকার গ্রেফতার করেছিলেন। তারপর 'মুসলিম বাংলা'র আর কোন তৎপরতা দৃষ্টিগোচর না হলেও বাংলাদেশ পুনরায় পাকিস্তান হয়ে যাচ্ছে এমন ঘটনা অহরহই শোনা যেত। তার পেছনে উদ্দেশ্য কি ছিল এবং এহেন উদ্ভট রটনার সাথে কে বা কারা জড়িত ছিল তা আজ অবধি অপ্রকাশ্যই রয়ে গেছে। সে যাই হোক, মার্কিনী লবীই যে ঐ সকল প্রোপাগাণ্ডায় জড়িত ছিল তা এক রকম নিঃসন্দেহেই বলা চলে। মার্কিনীদের উদ্দেশ্য ছিল নতুন জাতির আশা-আকাংখায় চির ধরানো যাতে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সন্দেহ বিরাজ করে এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হয়ে পড়ে। বস্তুতপক্ষে হয়েছিলও কতকটা তাই।

এর পরের ইতিহাস আমাদের প্রায় সকলেরই এক রকম জানা। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে মার্কিনী লবীর আমলা শ্রেণী ধীরে ধীরে পায়ের তলায় মাটি সঞ্চয় করে নিতে থাকে এবং শেখ মুজিবর রহমানের চারিত্রিক উদারতা ঐ সকল আমলা গোষ্ঠীকে উত্তরোত্তর শক্তিশালী হয়ে উঠতে সহায়তা করে। পাকিস্তানে আটকে পড়া সামরিক এবং বেসামরিক আমলা মহলও বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করে সসম্মানেই নিজ নিজ জায়গা দখল করে নিতে সক্ষম হয়। এ ব্যাপারেও জনাব মুজিবর রহমানের দয়ার কোন সীমাই ছিলনা। ব্যাস। এমনি করে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে একদিকে মার্কিনী লবীর আমলা শ্রেণী পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং অপরদিকে প্রতিযোগিতামূলকভাবেই বাংলাদেশ উদ্ধারকারী (!) ভারতীয় চক্রও সামরিক এবং বেসামরিক আমলাদের মধ্যে সুকৌশলে অনুপ্রবেশ শুরু করে।

পাকিস্তান থেকে প্রত্যাবর্তনকারীদের মধ্য থেকে যারা যথাযোগ্য স্থান দখল করতে ব্যর্থ হয় ভারতীয় চক্র তাদেরকে গোপনে টোপ গিলিয়ে নিজেদের পক্ষে নিতে শুরু করে। প্রশাসনের অভ্যন্তরে এই সর্বনাশা প্রতিযোগিতা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে জন্ম দেয় দুরারোগ্য ব্যাধি এবং মারাত্মক জটিলতা। ধীরে ধীরে প্রশাসন হয়ে পড়ে স্থবির এবং অচল। সমস্যা নিরসনের তুলনায় সমস্যা নতুনতর রূপ নিতে নিতে জনকল্যাণমূলক সকল কর্মতৎপরতাই বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। জনপ্রিয় জননেতা শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে থাকে। প্রশাসনের আভ্যন্তরীণ টানাপোড়েনে শেখ মুজিবের পক্ষে কার্যকরীভাবে শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভবই হয়ে পড়ে। দিন অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথেই শেখ মুজিবের শাসন ক্ষমতা ক্রমশঃই হ্রাস পেতে থাকে। ফলে তেজী জননেতা শেখ মুজিবের মুখের আস্ফালন বৃদ্ধি পেতে থাকে। সব কিছুতেই

www.pathagar.com

অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন তিনি। দেশে সৃষ্টি করা হয় পরিকল্পিত খাদ্যাভাব। শুরু হয় মারাত্মক দুর্ভিক্ষ। প্রশাসন দ্বিধাবিভক্ত। সময় মত কোন কিছুই নড়ে না। রুশ লবীর মন্ত্রণায় মুজিব নিজের হাতেই সব কিছুর নিয়ন্ত্রণভার নেয়ার সিদ্ধান্তে জন্ম দিলেন 'বাকশাল' নামক একদলীয় শাসন ব্যবস্থা। প্রশাসনের টানাপোড়েনে মুজিব প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নিদারুণ ব্যর্থতার সম্মুখীন হওয়াতে তাঁর 'ক্যারিজমা' বা আকাশচুম্বি ভাবমূর্তি অনেক পূর্বেই নিঃশেষ হয়ে গেছিল ঠিক এমন একটি মুহূর্তে একদলীয় শাসন প্রবর্তনই তাঁর যেন কাল হয়ে দাঁড়াল। ক্ষমতাচ্যুত এবং নিহত হলেন মুজিব সপরিবারে। রটনা আছে মার্কিনী লবীই শেখ মুজিবকে হত্যা করিয়েছে। বিষয়টি এখনো নানানভাবেই বিতর্কিত। তবে একটি বিষয় অবশ্যই বিতর্কের উর্ধে যে, স্বাধীন বাংলাদেশে মুজিবের মত একজন ভাবমূর্তি সম্পন্ন জননেতার যদি অমন করুণ পরিণতি হতে পারে, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন অথবা ক্ষমতাসীন হতে আগ্রহী নেতাদের মুজিব থেকে ভিন্ন পরিণতির কী কোনই আশা থাকতে পারে, যতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো হতে মার্কিনী এবং ভারতীয় ভূতের আছর দূরীভূত না করা হবে? এমন কোন পদ্ধতি রয়েছে কী যার মাধ্যমে প্রশাসনকে বাংলাদেশমূখী করে তোলা যায়?

আলোচিত প্রশ্নটির নিষ্পত্তি ছাড়া বাংলাদেশের কোন রাষ্ট্র প্রধানকেই জীবনে বাঁচিয়ে রাখা আদৌ সম্ভব হবে না। সম্ভব হবে না প্রশাসনকে গণমূখী অথবা জনকল্যাণমুখী করে তোলা। তাই সর্বপ্রথমেই একটি প্রশ্নের সমাধান নিয়ে আমাদেরকে ভাবতেই হবে এবং সেটি হচ্ছে, বাংলাদেশে কার মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে দেয়া হবে–আমেরিকার? ভারতের? না বাংলাদেশী জনগণের?

'৭২ থেকে ৮৯, দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপর মার্কিনী লবীর প্রভাব এখন জমজমাট। রাষ্ট্রীয় পলিসি এবং সকল পরিকল্পনা গ্রহণে মার্কিনী স্বার্থের পরিপন্থী কিছুই ঘটছেনা বাংলাদেশে। শিল্প-কারখানা ঢালাওভাবেই বিরাষ্ট্রীয়করণ করা হয়েছে তাদের সন্তুষ্টির প্রতি খেয়াল রেখেই। একের পর এক ব্যাংক এবং বীমা কোম্পানীকে বেসরকারীকরণ করা হয়েছে। চিটাগাং বন্দরে সৃষ্টি করা হয়েছে ট্যাক্স 'ফ্রী জোন।' এসব কিছুই করা হয়েছে মার্কিনীদের সুবিধার্থে। 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচীতে, হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ এবং অনুদান হিসেবে বাংলাদেশকে প্রচুর অর্থ সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে আমেরিকা সরকার। বাংলাদেশের উপর এত যাদের দয়া ও করুণা তাদের মালিকানা বাংলাদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে না তো হবে আর কাদের?' চক্ষু লজ্জা বলেতো একটা ব্যাপার-স্যাপার রয়েছে। তা হোক, বাংলাদেশে মার্কিনীদেরই মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাক না। দেশের গরীব জনগণ বিশ্বের

www.pathagar.com

অন্যতম ধনী এবং পরাশক্তি আমেরিকার পোষা লোক হয়ে গেলে খেয়ে-পরেতো বেঁচে যাবে। তা কি আর হবে আদর্শের বুলি কপচিয়ে। আদর্শতো আর ভাত দেবে না[কথাগুলো শুনতে আপত্তিকর হলেও, নিতান্তই বাস্তব কথা এগুলো। আজকাল অফিস আদালতের উচ্চপদস্থ কর্মচারীসহ কিছু কিছু তথাকথিত বুদ্ধিজীবী এবং প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী মহল ঐ ধরনেরই উক্তি করেন। বিশেষ করে রাজনীতিবিদদের কাছে তাদের কথা বলার ধরনটাই ঐ রকম।

'আরে ভাই, রাজনীতি করে করে দেশটাকে গোল্লায় নিলেনতো, এবারে দয়া করে দেশের জনগণকে খেয়ে-পরে বাঁচতে দিন একটু।' 'বাংলাদেশকে আমেরিকার কাছে লীজ দিয়ে দিন না, সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। ব্যাংকক এবং সিংগাপুরের মত আমরাও স্মার্ট হয়ে যাবো- অর্থনীতি চাঙ্গা হয়ে উঠবে।' কি অনায়াসেই কথাগুলো বলে ফেলেন তারা। তারাই যেন আমেরিকার পক্ষ থেকে দলিল-দস্তাবেজ তৈরী করে বাংলাদেশের লীজ গ্রহণ করতে প্রস্তুত এবং এরকম একটা ব্যবস্থা নেয়া হলেই বোধ হয় বাংলাদেশ চিরদিনের জন্য উদ্ধার পেয়ে যাবে, ভাবখানা কতকটা তাই। স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করার কী মহৎই না দৃষ্টিভংগী? কতো সহজে এরা স্বাধীনতার বিকিকিনি করে বসে। এদের হাতে সত্যিই যদি দেশের মালিকানা থাকতো, তাহলে কাউকে না জানিয়েই হয়তো তারা দেশ বিক্রি করে জাতি উদ্ধারের চেষ্টা করতো। এদের কথাই বলি কেন? বর্তমান সরকার কি নীরবে বসে আছে? তারা কি বিভিন্ন কৌশলে দেশ বিক্রির চেষ্টায় লিপ্ত নয়? দেশ বিক্রি করে জাতি উদ্বার করার ধৃষ্টতা যারা দেখাচ্ছে তাদের সংখ্যা নেহায়েত কম নয় এবং সম্পদ ও প্রতিপত্তির দিক থেকে তারা সমাজে সুদৃঢ়ভাবেই প্রতিষ্ঠিত। মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদের প্রকাশ্য দালালীর মধ্য দিয়েই যে তারা তাদের ভাগ্য গড়ে তুলেছে এ বিষয়ে সন্দেহের আর কোন অবকাশই নেই। কিন্তু তাদের খেয়াল-খুশীর উপর কী নির্ভর করতে থাকবে দেশ-জাতির ভাগ্য? ইচ্ছা করলেই কী দেশ-জাতিকে বিক্রি করা যায়? এ দুঃসাহস তারা পায় কোথেকে? নিশ্চয়ই তাহলে এটা তাদের নিছক খেয়াল খুশী নয়, এর পেছনে নীলনক্শাা রয়েছে। এটা একটা সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ। এভাবেই মার্কিনী পোষা দালালরা দেশ ও জাতির মন-মানসিকতায় পরাধীনতামূখী চিন্তা-ভাবনার উন্মেষ ঘটিয়ে ধীরে ধীর জাতিকে আত্মসমর্পণের একটা স্তরে নিয়ে আসে।

তাহলে প্রতিবেশী ভারতেরই বা এমন দোষ কী? তারাতো আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। যুগ যুগের সম্পর্ক তাদের সাথে। তাছাড়া ১৯৭১ সনে পাক হানাদার বাহিনীর নির্মম অত্যাচারের কবল থেকে তারাইতো অস্ত্র, গোলাবারুদ এমন কি টাকা-পয়সা দিয়ে বাঙালীদেরকে রক্ষা করেছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর

www.pathagar.com

সদস্যরা রক্ত ঝরিয়েছে বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধে। তাদের অবদানের তুলনা নেই। মুক্তিযুদ্ধের পরে না হয় একটু -আধটু লুট করেছে, তাতে এমন দোষের বা কি হল? সেনাবাহিনী কি লুটতরাজ করে না? বাংলাদেশের সেনাবাহিনী জেনারেল এরশাদের নেতৃত্বে কি কম লুট করে বেড়াচ্ছে? তাতে যদি কোন অপরাধ না হয়ে থাকে, তা যদি আমরা নীরবে সয়ে যেতে পারি, তাহলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্যকারী ভারতীয় সৈন্য কর্তৃক লুট-তরাজের দৃশ্য আমরা সয়ে থাকতে পারব না কেন? বাংলাদেশের উপর আর কারো যত না দাবী তারচেয়ে অনেক বেশী দাবী প্রতিবেশী ভারতের। তাই আমেরিকার কলোনী হতে যাব কোন্ দুঃখে, আমেরিকার কাছে বিক্রিই বা হতে যাব কোন্ যুক্তিতে?

প্রতিবেশী ভারতইতো আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু। তার কাছেতো আর আমাদের বিক্রি হতে হবে না। ভারততো আর বাংলাদেশকে কলোনী হিসেবে পেতে চায়না। ভারত চায় বাংলাদেশকে সাথে নিয়ে চলতে, অর্থাৎ বাংলাদেশ সমমর্যাদায় ভারতেরই অংশ হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে না থাকবে কোন কলোনী হওয়ার প্রশ্ন, না থাকবে বিক্রি হওয়ার প্রশ্ন। কত সুন্দর নয়, 'আমরা বিশাল ভারতেরই অঙ্গ হব। আমাদের লাখ লাখ বেকার বিশাল ভরতবর্ষের দিকে দিকে ছুটে বেড়াবে। চাকুরী করবে।' যুক্তি-তর্কের দিক দিয়ে ভারতপন্থীদেরকে অনেক জোরালো মনে হলেও বাংলাদেশের জনগণ ভারত-ভীতি রোগে আক্রান্ত, আমেরিকা ভীতি তাদের মধ্যে নেই। সাধারণ জনগণের ধারণাটা আবার অত্যন্ত সরল। তাদের মতে, কলোনী হতে হলে ধনী জাতির কলোনী হব, গরীব ভারতের কলোনী হয়ে লাভের তুলনায় লোকসানই বেশী। এহেন মন্তব্য, পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি-তর্ক, ঝগড়া-ফ্যাসাদ ইত্যাদি আজকাল বিভিন্ন পরিসরে প্রায়শঃই শোনা যায়। সচেতন এবং সুবিধেবাদী রাজনৈতিক মহল, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য পেশাজীবীরা দেশ ও জাতি সম্পর্কে আমেরিকা এবং ভারতকে কেন্দ্র করে এক ধরনের গল্প-গুজব এবং জল্পনা-কল্পনা চালিয়ে যাচ্ছে। সাধারণ জনগণ মাঝে-মধ্যে টিপ্পনীর ছলে কখনো ভারত, কিম্বা কখনো আমেরিকার পক্ষে মতামত প্রকাশ করা শুরু করে দিয়েছে। লক্ষণটা বাঞ্ছনীয় নয়। মানসিক দিক দিয়ে সাধারণ জনগণ স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছে। স্বাধীনতার আকর্ষণ আজ আর তাদের মধ্যে নেই। পুত্র-কন্যা, স্বজন হারিয়ে পাওয়া স্বাধীনতার স্বাদ আজ তাদের কাছে তেঁতো। তাই স্বাধীনতা বিক্রি হওয়ার খবরে তারা আজ বিচলিত হয়ে ওঠেনা।

এতো গেল ক্ষমতা বহির্ভূত মানুষের ধ্যন-ধারণার কথা। সমস্যা হচ্ছে ক্ষমতাসীন মহল সামরিক এবং বেসামরিক আমলাদের নিয়ে। তাদের মধ্যেওতো রয়ে গেছে মার্কিনী এবং ভারতীয় লবীর প্রতিযোগিতা। তারা দেশের

www.pathagar.com

সার্বিক পরিস্থিতির সুযোগে জাতিকে নিয়ে কোন্ সর্বনাশা খেলায় মেতে ওঠে সেটাই এখন দুর্ভাবনার বিষয়। তাই দেশ ও জাতির এই ক্রান্তিকালে প্রয়োজন কেবল তাদেরকেই যারা আমেরিকা, কিম্বা ভারতের নয়, বাংলাদেশের উপর বাংলাদেশীদেরই মালিকানা এবং কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর।

সর্বময় কর্তৃত্ব এবং মালিকানাতো পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালারই, কিন্তু বাংলাদেশের মাটিতে বসবাসকারী মানুষ আল্লাহরই একমাত্র প্রতিনিধিত্ব করবে- আমেরিকা, কিম্বা ভারতের প্রতিনিধিত্ব নয়।

সেই ঈমানদার বাংলাদেশী মানুষেরই আজ সর্বাধিক প্রয়োজন। রাজনীতিবিদ, সমাজবিদ, বুদ্ধিজীবী, সামরিক এবং বেসামরিক চাকুরীজীবীদের মধ্যে যারা ঈমানদার রয়েছেন, যারা একমাত্র আল্লাহর প্রতিই 'তাওয়াক্কুল' বা ভরসা করেন তাদেরকেই আজ দেশ ও জাতির দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হবে।

আমেরিকা, রাশিয়া, কিম্বা ভারতের উপর নির্ভরশীল নয়, বিশ্ব স্রষ্টা পরম করুণাময় সেই আল্লাহর উপরই আমাদেরকে নির্ভরশীল হতে হবে। কোন শক্তিশালী বিদেশী রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল হলেই বাংলাদেশের মানুষ খেয়ে-পরে বেঁচে যাবে এ ধরনের চিন্তা-চেতনা যারা পোষণ করেন, তারা মুলতঃ শেরকী গুনাহতে পতিত হচ্ছেন, ধর্ম বিশ্বাসের দিক দিয়ে মুসলমান হলেও কোরআন-সুন্নাহ মতে তারা কতটুকু মুসলমান থাকছেন তা দেশের আলেম উলেমাবৃন্দই ভাল বুঝতে পারবেন। তবে এ কথা সত্য যে, বিদেশী রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীলতার পক্ষে যারা মতামত প্রকাশ করেন তারা দেশ ও জাতির বন্ধু নয়, স্বাধীনতার প্রয়োজন তাদের নেই। তারা বিদেশী রষ্ট্রেরই পোষা এজেন্ট — পরাধীনতায় তারা চির অভ্যস্ত।

কিন্তু দেশ ও জাতির স্বাধীনতার প্রয়োজন রয়েছে। সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত দেশপ্রেমিক ভাই-বোনদেরকে সর্তক হতে হবে, সংগঠিত হয়ে উঠতে হবে এবং প্রশাসনের সকল স্তর থেকে বিদেশী রাষ্ট্র কর্তৃক পোষা এজেন্টদেরকে দেশ ও জাতির ভবিষ্যতের স্বার্থে চিহ্নিত করতেই হবে এবং সময় ও সুযোগমত তাদের মুলোৎপাটনও করতে হবে। অন্যথায় বাঙালীরা শাসন করার অধিকার হারিয়ে বসবে, নিক্ষিপ্ত হবে পরাধীনতার অনলে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে মার্কিনী এবং ভারতীয় অথবা রুশীসহ অন্য কোন লবীর পক্ষে শক্তি সঞ্চয় করার প্রতিযোগিতা চলবে কেন? বাংলাদেশের জনগণের কল্যাণ, শান্তি এবং প্রগতি বৃদ্ধি করার পক্ষে প্রতিযোগিতা চলুক তাতে আপত্তি করার কিছুই

www.pathagar.com

থাকবে না, উপরন্তু গর্ব করার থাকবে অনেক কিছুই। আমেরিকান প্রীতি, রাশিয়ান প্রীতি, ভারত প্রীতি এসব প্রীতিই যত অনর্থের মূল।

প্রীতি দাসত্বে ইতি হলে সর্বনাশ, প্রীতি পরস্পরের মর্যাদা এবং উন্নতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে অব্যাহত রাখতে সক্ষম হলে সে প্রীতিকে দেশ ও জাতি স্বাগতম জানাতে বাধ্য।

কথা প্রসঙ্গেই বলতে হয়, যেমন ভারত প্রীতি' দেশ ও জাতির মানস পটে 'ভারত–ভীতি' হয়ে জেগে ওঠে। অহেতুকতো আর তা হয় না। পেছনে রয়েছে নিশ্চিত কারণ। বাংলাদেশের রাজনীতিতে যারা ভারত–প্রীতির সূত্রে গেঁথে গেছেন, তাদেরকে ভারতের বিরাটত্ব এতই মুগ্ধ করে ফেলেছে যে 'ভারত মাতা কী জয়' বলতে পারলে যেন ধন্য হন তারা। আর এতে করে স্বাধীনতাকামী বাংলাদেশের মানুষের মনে জাগে প্রচণ্ড শংকা। যে ভারত নিজের দেশের মানুষ 'হরিজনকে' জীবন্ত দশায় জবরদস্তিমূলক পুড়িয়ে হত্যা করতে পারে, সেই ভারতের খপ্পরে সাধে কী আর কেউ পড়তে চায়? যারা ভারত কেলীতে মত্ত তারা দ্রৌপদীর জীবন সুখ ভোগে ধন্য হোক, স্বাধীনতাকামী বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ নরকের কীট হয়েও স্বাধীন বাংলাদেশেই স্বকীয়তা সহকারে বাঁচতে চায়। স্বাধীনতাই আমাদের কাছে প্রিয়।

বাঙালীর অধিকার ছাড়া বাংলাদেশে আর কারো অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে দেয়া হবে না এই দীপ্ত শপথ নিয়েই সকল বিদেশী শক্তির বিছানো জাল ছিন্ন করে দেয়া হোক এইতো দেশবাসীর কামনা।

কোটি কোটি মানুষের উপরোক্ত কামনা পূরণ করার জন্য দেশ ও জাতির মধ্যেই উন্মেষ ঘটুক নতুন নেতৃত্বের, যে নেতৃত্ব কোন বিদেশী লবীর উপর নির্ভরশীল হয়ে জাতিকে বাঁচাতে চাইবে না, চাইবে স্রষ্টার প্রতি পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীলতার মাধ্যমে আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান হয়ে উঠতে।

বিভিন্ন বিদেশী প্রভাবে গড়ে ওঠা এদেশের প্রশাসনিক কাঠামো টিকিয়ে রাখা হবে কি হবে না এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির উপরই নির্ভর করছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বাংলাদেশের জনগণ ভোগ করবে, না বিদেশী শক্তিসমূহ এবং তাদের নিয়োজিত কতিপয় এজেন্টরা ভোগ করবে। দেশ ও জাতির সম্মুখে এখনো সময় এবং সুযোগ রয়েছে– সিদ্ধান্ত আমাদেরকে গ্রহণ করতেই হবে।

www.pathagar.com

শেষ কথা

শেষ কথা হচ্ছে, স্বাধীনতা প্রাপ্তি উত্তেজনাময় এবং আনন্দদায়ক, দায়িত্বহীনভাবে স্বাধীনতা ভোগ দুর্গতি এবং কলংকের সূত্রপাত করে এবং স্বাধীনতা হারানোর মধ্য দিয়ে দাসত্বমূলক গ্লানি এবং যাতনার অভিশাপে আড়ষ্ঠ হয়ে আসে জীবন।

চরম উত্তেজনার মধ্য দিয়েই একদিন বাঙালী জাতি সেই স্বাধীনতাকে মহাআনন্দ-উল্লাসে বরণ করে নিয়েছিল, কিন্তু স্বাধীনতা ভোগ করতে গিয়ে জাতিগতভাবেই আমরা সীমাহীন দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছি।

জাতীয় উৎপাদন, সম্পদ বৃদ্ধি এবং রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি আমরা যতটা না যত্নবান হয়েছি, তার তুলনায় অনেক বেশী বেপরোয়া হয়ে উঠেছি সম্পদ লুন্ঠনে।

দেশ ও জাতিকে দিকনির্দেশনার তুলনায় অনেক বেশী তৎপর হয়েছি মূল্যবোধের মূলে কুঠারাঘাত হানতে। বিভিন্ন দর্শন ও ধর্মের চড়া বলির আড়ালে আমরা ঢেকে রাখার চেষ্টা করেছি আমাদের কুৎসিত চেহারাগুলো।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে সমস্যা জমে জমে স্তূপাকার হয়ে উঠেছে।

সমস্যার চেহারা এখন রীতিমত ভীতিজনক। দেশের দায়িত্ব গ্রহণকারীদের সাথে সমস্যার যেন কোন সংঘর্ষও নেই, সম্পর্কও নেই। সম্পর্ক কেবল এতটুকুই যে, সমস্যা বৃদ্ধি করে যেতে তাদের কোন কার্পণ্যই নেই। সমস্যা সমস্যাই থেকে যাচ্ছে আর দায়িত্ব তার আপন পরিমণ্ডলেই ভোগ-লালসায় লিপ্ত। বিদেশ থেকে ভিক্ষা করা, দেশের অভ্যন্তরে দুর্নীতি করা, খরা এবং ঝড়ের তাণ্ডবলীলায় লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন তছনছ হয়ে যাওয়া, রেল, বাস, লঞ্চ দুর্ঘটনায় হাজার হাজার মানুষের অকাল মৃত্যু হওয়া, শহীদ পরিবারের এতিম কন্যা রীমা হত্যার মত শত শত নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবং ধর্ষণের লোমহর্ষক ঘটনাবলী ঘটে যাওয়ার মত আরো আরো অসংখ্য নির্মম এবং করুণ দুর্ঘটনা বা সমস্যা জাতির সম্মুখে বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও আমাদের জাতীয় টেলিভিশনের পর্দায় নাচ-গানের আসরে ভাটা পড়ে না, ভাটা পড়ে না নিত্য ভোজনে, আমোদ-প্রমোদে আমরা আজো শিখানো গান গেয়েই যাচ্ছি, নেচেই যাচ্ছি বৈশাখী মেলায়। অপূর্ব! সত্যিই অপূর্ব আমাদের বিবেক, বিচিত্র আমাদের দায়িত্ববোধ।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন দূতাবাসের রাষ্ট্রদূতরা এই বলে বিস্ময় প্রকাশ করেঃ "বলো তো, সারা বিশ্ব থেকে ভিক্ষা করে জীবন ধারণের পরও তোমরা গান গাও কী করে? কী করেই বা নাচো তোমরা? তোমাদের টেলিভিশন খুলতেই নাচ আর গান। জনসভাসহ প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানেই পরিবেশিত হয় নাচ আর গান। তোমরা কী একটিবারও তোমাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে ভাব না?" কথাগুলো শুনেই সহজেই বলেছিলাম "হ্যাঁ, ভাবি, —খুউব ভাবি। আর ভাবি বলেইতো ২২ পরিবার থেকে ২২ হাজার কোটিপতি পরিবার সৃষ্টি হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশে। সম্পদ বৃদ্ধির সহজতম ফন্দি-ফিকির আবিষ্কার করা থেকে কী করে অর্জিত সম্পদ বিদেশী ব্যাংকে পাচার করে দেয়া যায় এনিয়ে কী আর আমাদের কম ভাবনা!

প্রশ্নকারী রাষ্ট্রদূতবর্গ শুনে নীরব হয়ে যায়- বলার পর আমি নিজেই যেন লজ্জায় মূক এবং বধির হয়ে যেতে চেয়েছি। সত্যি কথা বলতে, বাংলাদেশের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে এখন আর 'স্বাধীনতা' নামক বস্তুটি যেন আর দেখাই যায় না, সমস্যার ভারে চাপা পড়ে গেছে স্বাধীনতা। অথচ এই স্বাধীনতা আমাদেরই রক্তে ভেজা স্বাধীনতা, এর পতাকায় রয়েছে আমাদেরই রক্তের ছাপ, এর প্রাণে রয়েছে আমাদের ধর্ষিতা মা-বোনের হাহাকারপূর্ণ শেষ চীৎকার-আকূল আর্তি।

এই স্বাধীনতা বাঙালীকে স্বাধীন জাতি সত্তা হিসেবে বিকশিত হওয়ার অপূর্ব সুযোগ প্রদান করেছে। এই স্বাধীনতা আমাদেরকে নতুন করে বাঁচতে শিখিয়েছে। এই স্বাধীনতা আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের ললাটে হবে জয়টীকা। এই স্বাধীনতা হবে আমাদের পরিচয়, গর্ব এবং গৌরব। সকলের উদাসীনতা এবং দায়িত্বহীনতা দিয়ে আমরা স্বাধীনতার মত এই পরম পাওয়াকে কেনই বা ধূলিসাৎ করার এমন কুৎসিত খেলায় মেতে উঠেছি?

স্বাধীনতা হারানোর অপমান, বেদনা, বঞ্চনা এবং লাঞ্ছনা আমরা কী অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে মোটেও উপলব্ধি করতে পারছিনে? এ সকল প্রশ্নে দেশ-জাতি আজ এতটা নির্বিকার কেন? আমাদের উপলব্ধির সকল শিরা-উপশিরা থিতিয়ে গেছে কী? বিবেকের তাড়না কী একেবারেই স্তব্ধ হয়ে পড়েছে? দেশ ও জাতিকে নতুন করে ভাবতেই হবে- মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াবার শক্তি ও কৌশল অর্জন করতেই হবে।

আন্দোলনের নতুন দাবী হোক স্বাধীনতা রক্ষা করার আপোষহীন দাবী। এবারের আন্দোলন হোক স্বাধীন মাটিতে বসবাসকারী প্রত্যেকটি নাগরিকের অধিকার, মর্যাদা এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। এবারের সংকল্প হোক

www.pathagar.com

বন্যা, খরাসহ সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করার বজ্র কঠিন অঙ্গীকার। এবারের আত্মপ্রত্যয় হোক নিজস্ব সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক পরিচয় সুপ্রতিষ্ঠিত করার মধ্য দিয়ে স্বাধীন জাতিসত্তা বিকাশের সর্বদ্বার উন্মুক্ত করে দেয়ার বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়। বিরাজমান দুর্নীতি, ভণ্ডামী এবং স্বৈরাচারপূর্ণ শাসন ব্যবস্থার মুল্যোৎপাটনসহ এবারের আন্দোলন হোক গুণগত পরিবর্তনের সুস্পষ্ট লক্ষ্যে। সর্বশেষ কথা, জাতি আজ অসুস্থ, দেশ শান্ত। এই অসুস্থ জাতি এবং শান্ত দেশটিরই দায়িত্ব নেবে কে?

অসুস্থ জাতিকে দিতে হবে সুস্থতা, শান্ত দেশকে রূপান্তরিত করতে হবে কর্মচঞ্চল দেশ হিসেবে। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নেতৃত্ব কী জাতির আশা-আকাংখা পূরণ করার যোগ্যতা রাখে?

দেশ ও জাতির জন্য আজ প্রয়োজন আদর্শিক এবং দয়িত্বশীল নেতৃত্ব। দাবী করলেই আন্দোলন গড়ে ওঠেনা, আন্দোলন গড়ে উঠলেই নেতৃত্বের মধ্যে দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্যতা আপনা আপনিই জন্মায় না।

দাবী এবং আন্দোলনের সাথে ঘনিষ্ঠতম সংযোগ ঘটাতে হবে দায়িত্ব পালনের যোগ্য নেতৃত্বের। তাহলেই হয়তবা চলতি বিংশ শতাব্দীর শেষ অবধি বাংলাদেশের জনগণ মাথা উঁচু করে বিশ্বের কাছে চীৎকার করে বলতে পারবে ঃ

"আমরা বাঁচতে চেয়েছিলাম গর্ব, গৌরব

এবং আত্মমর্যাদা সহকারে, বাঁচার সেই

পথ আমরা খুঁজে পেয়েছি।"

—সমাপ্ত—

www.pathagar.com